বিজন অশ্রুবিন্দু

দশম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯

সম্পাদক

মাহমুদ মিটুল

আড্ডা ধানসিড়ি, বরিশাল

বিজন অশ্রুবিন্দু

সংখ্যা ১০, বর্ষ ১০

প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০১৯

উপদেষ্টা সম্পাদক

মুহম্মদ মুহসিন

সম্পাদক

মাহমুদ মিটুল

সহযোগী সম্পাদক

শফিক আমিন

প্রচ্ছদ ও নামলিপি

প্রয়াত রাসেল আহমেদ

প্রকাশক

সৈয়দ সগির উদ্দিন আহমেদ

প্রাপ্তিস্থান

লিটলম্যাগ প্রাঙ্গণ, ৮০ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা

বুক ভিলা, বরিশাল

সম্পাদকীয় যোগাযোগ

মুঠোফোন: ০১৭১২৭৯৫০২৪

ইমেইল: mahmud_mitul@yahoo.com

শুভেচ্ছা মূল্য:

সম্পাদকের কথা

ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের জাতীয় জীবনে একই সাথে গৌরব ও শোকের মাস। এ-মাসের মাহাত্ম্য কতোখানি তা বাঙালি মাত্রই জ্ঞাত। কিন্তু একই সাথে *বিজন অশ্রুবিন্দুর* পাঠকের জন্যও এ-মাস বেশ গুরুত্ববহ। কারণ দশ বছর পূর্বে ২০০৯ সালের এই মহান মাসেই *বিজন অশ্রুবিন্দুর* আবির্ভাব ঘটেছিলো বরিশালের এক বিজন কক্ষে। এটা ভীষণ আনন্দের বিষয় যে *বিজন অশ্রুবিন্দু* এবার দশম বছরে পদার্পণ করে এর দশম সংখ্যায় এসে উপনীত হয়েছে। এই সাফল্যের কৃতিত্ব পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সবার– বিশেষ করে লেখকদের, যারা তাদের মেধা ও শ্রমলব্ধ লেখা দিয়ে পত্রিকাকে মানসম্মত করে তুলেছেন। এছাড়াও এই সাফল্য পাঠকদের যাদের ঐকান্তিক আগ্রহ *বিজন অশ্রুবিন্দুর* যাত্রাকে ত্বরান্বিত করেছে। *বিজন অশ্রুবিন্দুর* প্রথম সংখ্যা থেকে দশম সংখ্যা পর্যন্ত সকল শুভানুধ্যায়ী, পাঠক, লেখক, কলাকুশলিদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানিয়ে এই সংখ্যাটি প্রকাশ করছি।

আপনারা জ্ঞাত যে পত্রিকাটি সপ্তম সংখ্যা থেকে *আড্ডা ধানসিড়ির* আয়োজনে প্রকাশিত হচ্ছে। এবারো একই ধারাবাহিকতায় সাজানো হয়েছে সংখ্যাটি। নবম সংখ্যার মতোই এ সংখ্যাকেও সাজানো হয়েছে তিনটি আলাদা পর্বে– 'আমাদের সেকালের গ্রন্থকথা', 'আমাদের একালের গ্রন্থকথা' ও 'আমাদের আড্ডারুদের সাহিত্যকথা'। এর সাথে এবার যুক্ত হলো একটি বিশেষ পর্ব, যার শিরোনাম 'আমাদের স্মরণ কথা'। প্রতিপর্বের লেখাগুলো বিন্যাস্ত করা হয়েছে লেখক নামের বর্ণানুক্রম অনুসারে।

'আমাদের সেকালের গ্রন্থকথা' অংশে থাকছে চান্দ্রদ্বীপি পাঁচজন লেখকের লুপ্তপ্রায় পাঁচটি গ্রন্থালোচনা। গ্রন্থগুলো এককালে বেশ সারা জাগালেও বর্তমানে পাঠকের বিস্মৃতিতে চলে গেছে বা বলা যায় যেগুলো সাহিত্য রাজনীতির শিকার হয়ে অন্ধকারে সাঁতার কাটছে। এবারের আয়োজনে আমরা তুলে আনার চেষ্টা করেছি কবি কামিনী রায়ের *মাল্য ও নির্মাল্য*, চারণ সম্রাট মুকুন্দদাসের *সমাজ*, আততায়ীর হাতে নিহত কবি হুমায়ূন কবিরের *কুসুমিত ইস্পাত*, কবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের *জাতীয় মঙ্গল* ও কথাশিল্পী মোহাম্মদ কাসেমের *বিষমক্রান্তি*। এছাড়া নবীন পাঠকদের কথা বিবেচনা করে আলোচ্য লেখকদের জীবন ও সাহিত্যকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি মূল নিবন্ধের পূর্বে বন্ধনীর মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে যাতে পাঠক এই অধুনালুপ্ত গ্রন্থের লেখকদের জীবনচরিত বিষয়ে একটি প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারেন।

'আমাদের একালের গ্রন্থকথা' পর্বে থাকছে চান্দ্রদ্বীপি সমসাময়িক ছয়জন সাহিত্যিকের ছয়টি গ্রন্থের উপর আলোচনা। এসংখ্যায় কাব্য কাপালিকের কলমে উঠে এসেছে কবি সরদার ফারুকের *অন্যদের তর্কে ঢুকে পড়ি* গ্রন্থের কাব্য পসরা, কামরুন নাহার মুন্নির আলোচনায় তুলে ধরেছেন অরূপ তালুকদারের *নির্বাচিত গল্প* গ্রন্থের বিবিধ বিষয়, জিনাত জাহান খানের ভাষায় হাবিবুল্লাহ রাসেলের কাব্যগ্রন্থ *কষ্ট নিয়ে যাও* ও *ফেরিওয়ালা মেঘ* এর ভাব ও ভাবনা, মিছিল খন্দকারের বয়ানে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণকারী কবি সুমন প্রবাহনের একমাত্র কাব্যগ্রন্থ *পতন* ও *প্রার্থনার* বোধের গভীরতা, রাত উল আহমেদের কথায় সামতান রহমানের কাব্যগ্রন্থ *হর্সলুক পার্লারের* অত্যাধুনিক কাব্যভাষা এবং শ্যামল রায়ের বিশ্লেষণে সন্ধ্যা রায়সেনগুপ্তের *দুঃখসুখের ঝাঁপি এবং আমার একাত্তর* গ্রন্থের সমালোচনা। এপর্বে অগ্রজ-অনুজ ছয়জন লেখকের গ্রন্থালোচনা পাঠকদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেবে বলে আশা করা যায়।

পরবর্তী পর্ব 'আমাদের আড্ডারুদের সাহিত্যকথা'য় *আড্ডা ধানসিড়ি*, বরিশালের আড্ডারুদের বেশকিছু সৃষ্টিশীল লেখা ছাপা হলো। সবগুলোই কবিতা। এ পর্বের লেখাগুলোর ব্যাপারে বলা যায় যে এ পর্বে আমাদের আড্ডারু বন্ধুদের লেখাই কেবল স্থান পেয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞাতসারেই শিল্পমান রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। আড্ডারুদের প্রণোদনা প্রদানের কথা বিবেচনা করে প্রাপ্ত সবগুলো লেখাই রাখা হয়েছে।

সর্বশেষে আছে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পর্ব 'আমাদের স্মরণকথা'। *বিজন অশ্রুবিন্দুর* দশম সংখ্যার এ পর্বে করুণরসে সিক্ত আবেগঘন একটি স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধ যুক্ত করা হয়েছে। অকাল প্রয়াত চলচ্চিত্র নির্মাতা রাসেল আহমেদকে নিয়ে উক্ত লেখায় লেখক ঈয়ন স্মৃতিকথার ছলে আমাদের জানিয়েছেন এই প্রয়াত শিল্পীজীবনের সাতকাহন। এখানে বলে নেয়া দরকার যে *বিজন অশ্রুবিন্দুর* সাথে রাসেল আহমেদের সম্পর্ক শুরু থেকে অদ্যাবধি। প্রথম সংখ্যা থেকে দশম সংখ্যা পর্যন্ত এ পত্রিকার প্রচ্ছদ শিল্পী তিনি। বর্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদও তিনিই করেছিলেন। কিন্তু সময়ের নির্মম শিকারে পরিণত হয়ে ২০১৭ সালের ১৫ মে আমাদের সকলকে ছেড়ে পরপারে চলে গেছেন। আমি জানি না *বিজন অশ্রুবিন্দুর* পরবর্তী সংখ্যায় কে প্রচ্ছদ শিল্পী হবেন, কিন্তু সংশ্লিষ্ট সকলকে এটা জানাতে পারি, এই পত্রিকা যতোদিন থাকবে তিনিও ততোদিন বেঁচে থাকবেন আমাদের মাঝে। *বিজন*

অশ্রুবিন্দুর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষ থেকে তাই এ-সংখ্যাটি অকাল প্রয়াত চলচ্চিত্র নির্মাতা ও চিত্রশিল্পী রাসেল আহমেদকে উৎসর্গ করা হলো।

বানানের ব্যাপারে আগের সংখ্যাগুলোতেও বলে আসছি, তবুও নতুন পাঠকদের জন্য আবারো বলছি। পূর্বসংখ্যাগুলোর মতোই এ-সংখ্যায়ও আমরা বাংলা একাডেমির প্রমিত রীতি রক্ষার সাথে সাথে সামান্য ব্যতিক্রম ধারণ করছি; যেমন: অনেক ক্ষেত্রে 'ও' এর ব্যবহার না করে 'ো' এর ব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষ করে 'ও'কারান্ত উচ্চারণের ক্ষেত্রে। যেমন: 'কখনও' না লিখে 'কখনো' লেখা হয়েছে। ঊর্ধ্বকমা ও হাইপেনের ব্যবহার যতো সম্ভব কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া সর্বনাম পদে মর্যাদাসূচক চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার বাদ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আমরা কোনো সম্মানিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'তাঁর' না লিখে 'তার' লিখেছি। তবে কোনো ক্ষেত্রেই শব্দের মূল রূপের বা অর্থের ইচ্ছাকৃত অসঙ্গতি রাখা হয়নি, বরং অর্থ ও ধ্বনির সঙ্গতি বিধানেই আমাদের এ প্রচেষ্টা। এরপরো অর্থহীন কিছু থাকলে সেটাকে অনিচ্ছাকৃত ভুল ভেবে ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করছি।

এবারের সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে আরো একটা দায় আছে যা স্বীকার না করলেই নয়। নবম সংখ্যায় কথা ছিলো সর্বোচ্চ এক বছরের মধ্যে পরবর্তী সংখ্যা নিয়ে হাজির হবো। কিন্তু নানাবিধ কারণে তা সম্ভব হয়নি। এই অক্ষমতাকে পাঠক ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে বিশ্বাস করি। *বিজন অশ্রুবিন্দুর* সাথে সংশ্লিষ্ট সকল লেখক, পাঠক, কলাকুশলী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে পরবর্তী সংখ্যা আগামী বছরেই প্রকাশ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

সূচি

আমাদের সেকালের গ্রন্থকথা

কামিনী রায়: *মাল্য ও নির্মাল্য*

পম্পা মজুমদার

[বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি কামিনী রায়ের জন্ম ঝালকাঠি জেলার বাসণ্ডা গ্রামে। জন্ম ১২ অক্টোবর ১৮৬৪। মৃত্যু ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩।

কামিনী রায়ের পিতা চণ্ডীচরণ সেন ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী এবং সাহিত্যিক ও সাব-জজ ছিলেন। স্বামী স্ট্যাটিউটরি সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়। বেথুন কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স-সহ বি.এ. পাশ করে (১৮৮৬) উক্ত কলেজেই শিক্ষয়িত্রীর পদ পান। তিনিই ভারতে প্রথম মহিলা অনার্স গ্র্যাজুয়েট। পনেরো বছর বয়সে লেখা *আলো ও ছায়া* কাব্যগ্রন্থটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা-সমেত প্রকাশিত (১৮৮৯) হবার পর থেকেই কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৯৪ সালে তার বিয়ে হয় স্ট্যাটিউটরি সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সাথে। ১৯০১ সালে তার স্বামীর মৃত্যু হয়। ১৯২২-২৩ পর্যন্ত তিনি নারী শ্রমিক তদন্ত কমিশনের অন্যতম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩২-৩৩ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভানেত্রীর প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'মহাশ্বেতা' ও 'পুণ্ডরীক' তার দু-টি প্রসিদ্ধ দীর্ঘ কবিতা। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: *আলো ও ছায়া* (১৮৮৯), *নির্মাল্য* (১৮৯১), *পৌরাণিকী* (১৮৯৭), *গুঞ্জন* (১৯০৫) *মাল্য ও নির্মাল্য* (১৯১৩), সনেট সংগ্রহ, *অশোক-সঙ্গীত* (১৯১৪), নাট্য কাব্য *অম্বা* (১৯১৫), *ঠাকুরমার চিঠি* (১৯২৪), *দ্বীপ ও ধূপ* (১৯২৯) ও *জীবন পথে* (১৯৩০)। কাব্য সাধনায় তার কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে জগত্তারিনী স্বর্ণপদকে সম্মানিত করেন। তার ভগিনী যামিনী সেন লেডি ডাক্তার হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।– সম্পাদক]

'সংশয়ে সংকল্প সদা টলে,/ পাছে লোকে কিছু বলে।'- এই জনপ্রিয় চরণদ্বয়ের স্রষ্টা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)। কবির জন্ম ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের এমন এক ক্রান্তিলগ্নে যখন বাঙালি নারী ছিলো অন্তঃপুরবাসিনী, যেনো খাঁচায় পোষা পাখি। সমাজের বিধি-নিষেধ আর ক্রূর দৃষ্টির কাছে বারবার পরাজিত হয়েছে নারীর স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা। ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের সেই সামাজিক শৃঙ্খলের জাল ছিঁড়ে যে নারী অদম্য সাহস, তেজ আর মেধা দিয়ে নারীমুক্তির সরণি তৈরি করেছিলেন তিনি কামিনী রায়।

কবির সংকল্প সামাজিক অনুশাসন আর লোকভীতির কাছে পরাজিত হয়নি। উনিশ শতকের যে সমাজ-বাস্তবতায় নারীশিক্ষাকে কুপ্রথা হিসেবে গণ্য করা হতো সেই সমাজবাস্তবতায় দাঁড়িয়েই তিনি অর্জন করেছিলেন স্নাতক পর্যায়ের একাডেমিক ডিগ্রি। কবি শুধু বিএ পাশ করেই ক্ষান্ত হননি। একই সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত নারীর মুক্তি সম্ভব নয়। এই চিন্তাধারা থেকেই ব্যক্তিগত জীবনে হয়ে উঠেছিলেন স্বাবলম্বী। ১৮৮৬ সালে কবি বেথুন বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি এই মহীয়সী নারী জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্যসাধনার মাধ্যমে আলোকিত করে গেছেন গোটা বাঙালি জাতিকে।

মাত্র আট বছর বয়সে কবির কাব্যরচনার হাতেখড়ি। মূলত মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজসচেতন মন তাকে দিয়েছিলো কাব্যরচনার দীক্ষা। তার কাব্যের মূল উপাদান স্বদেশ, সমাজ ও মানুষ। কামিনী রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *আলো ও ছায়া* (১৮৮৯)। *আলো ও ছায়া* প্রকাশের পরপরই বাংলা সাহিত্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিলো। *আলো ও ছায়া*র পর একের পর এক প্রকাশিত হয়েছে *নির্মাল্য*, *পৌরাণিকী*, *গুঞ্জন*, *মাল্য ও নির্মাল্য*, *অশোক-সঙ্গীত* প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। কাব্যচর্চার পাশাপাশি গল্প, প্রবন্ধ, নাটক রচনায়ও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

আলো ও ছায়া কাব্যগ্রন্থে কবি আলো-আঁধার, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছিলেন তার অনুরণন দেখা যায় *মাল্য ও নির্মাল্য* কাব্যগ্রন্থে। *আলো ও ছায়া*র প্রায় ২৩ বছর পর *মাল্য ও নির্মাল্য* প্রকাশিত হয়। প্রকাশকালের দিক থেকে প্রায় দুই দশক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও অনেক সমালোচক *আলো ও ছায়া* এবং *মাল্য ও নির্মাল্য* কাব্যগ্রন্থকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে আখ্যা দেন।

কবি কামিনী রায়ের অনবদ্য সৃষ্টি *মাল্য ও নির্মাল্য* (১৯১৩) কাব্যগ্রন্থখানি। এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় কবির ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার ছায়াপাত লক্ষণীয়। এই কাব্যগ্রন্থে কবি কাব্যিক পেলবতায় জীবনদর্শনের গভীরে প্রবেশ করেছেন, একই সঙ্গে ভাব প্রকাশে হয়েছেন সংহত ও সংযত। মূলত কবি উচ্চশিক্ষিত ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার অধিকারী হলেও সমাজে প্রচলিত মতাদর্শকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে পারেননি। তাই বিবাহ-পরবর্তী জীবনে তিনি স্বামী-সংসার-সন্তানকেই ধ্যান-জ্ঞানরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কবি স্বভাবে যেমন কোমল ছিলেন তেমনি তার হৃদয় ছিলো বাঙালি নারীর চিরন্তন প্রেম-উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। একই সঙ্গে স্বামী-সন্তানের প্রতি কর্তব্যবশত কর্মজীবন ও সাহিত্যচর্চা থেকে নিয়েছিলেন বিরতি। কবির সেই ঐকান্তিক প্রেম-উচ্ছ্বাসের স্বরূপ তার কবিতায় লক্ষণীয়-

বুঝাইব কোন কথা দিয়া,
এ আমার সমুদয় হিয়া
তোমারে যে করিয়াছি দান,
কেমনে গাহিব আমি গান?
[আধ ঘুমে, মাল্য ও নির্মাল্য]

কবি প্রেম পিয়াসী। কবির প্রেম দৈহিক কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে আধ্যাত্মিক প্রেমেরই পরিচায়ক। কবি ভালোবাসতে চেয়েছেন কিন্তু ভোগের সামগ্রী হতে চাননি। 'ভালোবাসা' কবিতায় কবি ভালোবাসার প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। কবি বিশ্বাস করেন, লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা মানুষের আত্মাকে কলুষিত করে। কিন্তু চারপাশে ভালোবাসার এহেন রূপ প্রত্যক্ষ করে কবি ব্যথিত চিত্তে প্রশ্ন করেন-

তবে কিগো ভালোবাসা বাঞ্ছিত উদ্দেশে ভাসা,
ফেলি কুল, ভুলি দিক, গতি নিরুদ্দেশ?
প্রবৃত্তি পাষাণে ঠেকি পুণ্যের বিনাশ সে কি?
অকালে অকূলে ইহ জীবনের শেষ?
[ভালোবাসা, মাল্য ও নির্মাল্য]

কবি শুধু প্রশ্ন করেই দায় এড়াননি, একই সঙ্গে পাঠককে দিয়েছেন সত্যিকারের ভালোবাসার সন্ধান। কবি ভালোবাসার প্রচলিত ধারণাকে বাতিল করে দিয়ে বলেন-

আমি ভাবি ভালোবাসা ভালো হইবার আশা,
পরের ভিতরে পেয়ে ভালোর সন্ধান,
তার ভালোটুকু নিয়া সঞ্জীবিত রাখি হিয়া,
আপনার ভালো যাহা সব তারে দান;
[ভালোবাসা, মাল্য ও নির্মাল্য]

পদধ্বনি'তে কবি আশা-নিরাশার দোলাচলে দোদুল্যমান। কবিতাটির আদ্যোপান্ত জুড়ে বিষাদগ্রস্ত কবি হৃদয়ের হাহাকার পাঠক চিত্তেও বেদনার সঞ্চার করে। কবির ভাষায়

চারিদিকে এত পদধ্বনি
এত লোক করে যাতায়াত,
মুখ তুলে পথ পানে চেয়ে
অধোমুখে করি অশ্রুপাত।
[পদধ্বনি, মাল্য ও নির্মাল্য]

কবি তার হারিয়ে যাওয়া কোনো এক প্রিয় মানুষের পদধ্বনি শোনার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে অপেক্ষমাণ। *মাল্য ও নির্মাল্য* কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে কবি বেশ কিছু প্রিয় মানুষের মৃত্যু শোক পেয়েছেন। ১৯০০-১৯০৯ মাত্র ৯ বছরের ব্যবধানে তিনি হারিয়েছেন বাবা-বোন, স্বামী এবং সন্তানকে। একের পর এক মৃত্যুশোক কবিকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। বিশেষ করে ১৯০৯ সালে দুর্ঘটনায় স্বামীর মৃত্যুতে কবি প্রচণ্ডভাবে মানসিক আঘাত পান। কবি হয়তো চেতনে কিংবা অবচেতনে হারিয়ে যাওয়া সেই প্রিয় মানুষকে খুঁজে-ফিরে চলেছেন আজীবন। তাই 'পদধ্বনি' কবিতায় কবি আশায় বুক বেঁধে উচ্চারণ করেন-

শুনিয়াছি ব্যাকুলে ডাকিলে
হৃদে যায় হৃদয়ের ডাক,
এ আহ্বান পৌঁছিয়াছে তবে
এ বিশ্বের যেথায় সে থাক।
[পদধ্বনি, মাল্য ও নির্মাল্য]

মাল্য ও নির্মাল্যের বেশ কিছু কবিতায় নারী-পুরুষের প্রেম নিয়ে কবি সংশয় প্রকাশ করেছেন। কবির ব্যক্তিগত জীবনলব্ধ নানা অভিজ্ঞতা ও সমাজে বিদ্যমান নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিচিত্র টানাপোড়েন ও অসঙ্গতি কবিকে ব্যথিত করেছে বারবার। 'নারীর অভিমান' কবিতায় কবি বলেন-

বুঝিলে কি অবশেষে, অবোধ হৃদয়
সম্পূর্ণ কাহারো নহ, কেহ তব নয়?
.....
এক হয়ে গেছে দোঁহে, -তুমি মুগ্ধ ছিলে মোহে,
অনন্ত দূরত্ব মাঝে, আর কেন তবে?
[নারীর অভিমান, মাল্য ও নির্মাল্য]

'যবে ছিল ভালোবাসা'য় এক ভগ্ন হৃদয়ের হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে। এই কবিতায় প্রেমিক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত অশ্রুসিক্ত এক নারীর অসহায় অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। যে নারী প্রেমে ব্যর্থ হয়ে প্রেমিককে অভিসম্পাত করেননি বরং জীবনের কোনো এক মুহূর্তে প্রেমিকের স্মৃতিতে নতুন রূপে জেগে ওঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন-

মুমূর্ষু আনন্দটুকু, প্রিয়, সহসা কি মুহূর্তের লাগি
অতীতের প্রেমোন্মাদতব স্মৃতিতলে উঠিবে না জাগি?
বুঝিবে না, আমি যাহা আছি, তাই আমি ছিনু চিরদিন,
বিচিত্র তোমারি প্রেমালোকে লভেছিনু মাধুরী নবীন?

[যবে ছিল ভালোবাসা, মাল্য ও নির্মাল্য]

ব্যক্তিগত প্রেমের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি এই কাব্যগ্রন্থে কবির বাৎসল্য প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। বিবাহ-পরবর্তী জীবনে কবি কাব্যচর্চা থেকে বিরতি নেওয়ায় নানা সমালোচনার সম্মুখীন হন। কবি সমালোচকদের কথার উত্তর দিতে গিয়ে নিজ সন্তানদের জীবন্ত কবিতা হিসেবে আখ্যা দেন। মূলত কবিতা ও সন্তান উভয়ই কবির কাছে সমতুল্য। তাই কবি উচ্চারণ করেন-

পঙ্ক হতে যথা উঠে পঙ্কজিনী, ভূঁইচাঁপা ছাড়ি ভূঁই,
আমার হৃদয়ে মূলটুকু রাখি তেমনি উঠিলি তুই,-
তোর সাথে মোর জীবনের যোগ, তবু এক নহি-দুই।
জীবনের তব প্রথম অঙ্কুর উঠেছে আমারি দেহে,
যত দিন আছ, জীবনের মূল গুপ্ত এ আঁধার গেহে।

[পঙ্ক ও পঙ্কজ, মাল্য ও নির্মাল্য]

কামিনী রায় তার অধিকাংশ রচনায় বারবার নারী-অধিকারের কথা বলেছেন। আমাদের সমাজব্যবস্থায় নারীকে দেবীত্বের মর্যাদা দিয়ে গৃহকোণে বন্দী করে রাখা হয়। তাই কবি দেবী হতে চাননি, চেয়েছেন মানবী হতে, যাত্রাপথে পুরুষের সহযাত্রী হতে। কবির সাহসী উচ্চারণে তার এই প্রত্যয় স্পষ্ট-

তুমি যেন শুনে প্রিয়তম,
ভুলে যাও দীর্ঘপথশ্রম,
সম্মুখেতে হও আগুয়ান,
এমনে গাহিব আমি গান।

[আধ ঘুমে, মাল্য ও নির্মাল্য]

মাল্য ও নির্মাল্য কাব্যগ্রন্থের ভিন্নধর্মী একটি কবিতা 'হাত'। এই কবিতায় কবি জীবনদর্শনের গভীরে প্রবেশ করেছেন। কবি রূপের জৌলুসে নয়, গুণের মহিমায় সকলের হৃদয়ে স্থান পেতে চেয়েছেন। তাই বলেন-

রূপ নাকি কাছে টানে, গুণ বেঁধে রাখে হিয়া

[হাত, মাল্য ও নির্মাল্য]

একই সঙ্গে ছোট্ট এই কবিতায় রসচ্ছলে দিয়ে গেছেন নৈতিকতার শিক্ষা। কবি জানেন, মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রধান অবলম্বন- হাত। এই হাতের সঠিক ও সদ্ব্যবহার একজন মানুষকে দেবতার আসনে আসীন করতে পারে; আবার এই হাতের অপব্যবহার মানুষকে নিক্ষেপ করে আস্তাকুঁড়ে-

এ দু-খানি শুভ্র বাহু মালা করি পরি গলে,
এ হাত উঠাবে স্বর্গে, ডুবাবে বা রসাতলে।

[হাত, মাল্য ও নির্মাল্য]

এছাড়াও 'পুষ্প-প্রভঞ্জন', 'কর্তব্যের অন্তরায়', 'কোর না জিজ্ঞাসা' প্রভৃতি কবিতায় প্রেমের বিচিত্র দিক প্রকাশ পেয়েছে। কখনো সন্দেহ, কখনোবা শঙ্কা, কখনো অশ্রুসিক্ত হৃদয়ের হাহাকার কবিতাগুলোকে দিয়েছে বিচিত্র মাত্রা। সর্বদিক বিবেচনায় *মাল্য ও নির্মাল্য* কবির অনবদ্য সার্থক কাব্যগ্রন্থ।

চারণ কবি মুকুন্দদাস ও তার *সমাজ* যাত্রাপালা

বেগম ফয়জুন নাহার

[এই প্রবন্ধে কবি মুকুন্দদাসের জীবনী যথাসম্ভব তুলে ধরা হয়েছে বলে কবি পরিচিত বাহুল্য মনে করে বাদ দেয়া হলো। – সম্পাদক]

কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট
রক্তজমাট শিকল পূজোর পাষাণ বেদী।
ওরে ও তরুণ ঈশান! বাজা তোর প্রলয় বিষাণ।
ধ্বংস-নিশান উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি

[ভাঙ্গার গান, কাজী নজরুল ইসলাম]

ভয় কি মরণে, রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গি মেতেছে আজ, সমর রঙ্গে।
তাথৈ তাথৈ থৈ, দ্রিমি দ্রিমি দ্রং দ্রং
ভূত পিশাচ নাচে যোগিনী সঙ্গে।

[মুকুন্দদাস]

বাংলা সাহিত্যাকাশে ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা এক কিশোর যখন লেটোর দলে গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে যাত্রা নাটক করে বেড়াচ্ছিলেন তখন বরিশালে ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দুলিয়ে গেরুয়া উত্তরীয় পরে আরেক কবি 'করমের যুগ এসেছে, সবাই কাজে লেগে গেছে/ মোরা শুধু রব কি শয়ান?/ রহিব সবার নীচে, চলিব সবার পিছে/ সহিব শত অপমান'-এ গান নিয়ে শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে *স্বদেশী* যাত্রা করে ঘুমন্ত বাঙালি জাতিকে জাগানোর ব্রতে ব্রতী হয়েছিলেন। এদের প্রথম জন হলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, আর অপরজন চারণ সম্রাট কবি মুকুন্দদাস ।

যজ্ঞা গুন্ডা। স্কুল পালানো বখাটে ছেলেদের সর্দার বরিশাল শহরের সব কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে নিজের সরব উপস্থিতি প্রমাণে ব্যস্ত। নির্বিঘ্নে কোনো অনুষ্ঠান চলছে? পণ্ড করে দাও, বাতি নিভিয়ে দাও। তাঁবুর দড়ি কেটে ফেলা থেকে শুরু করে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে দূর থেকে সজোরে কাঁচা পেয়ারা বা নারকেল ছুঁড়ে মারা সব কাজেরই সে কাজী। এর বিপরীতে দুর্ঘটনার আগুন নেভানো, শ্মশানে মড়া পোড়ানো- এসব জনহিতকর কাজেরও সুষ্ঠু আনজাম দিতে যজ্ঞাগুন্ডার দলের জুড়ি নেই।

কে এই যজ্ঞাগুন্ডা? কীভাবেই বা যজ্ঞাগুন্ডা অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বর দে মুকুন্দদাস হলেন- এ আলোচনায় সে ইতিহাসের পাশাপাশি তার লেখা *সমাজ* যাত্রাপালা নিয়ে আলোচনা করবো।

ঢাকার তৎকালীন বিক্রমপুর জেলা, বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ি উপজেলার বানারী গ্রামে ১২৮৩ বঙ্গাব্দ (মতান্তরে ১২৮৫) মোতাবেক খ্রিস্টিয় ১৮৭৬ সালে যজ্ঞেশ্বর দে ওরফে মুকুন্দদাস গুরুদয়াল দে ও শ্যামাসুন্দরীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। যজ্ঞেশ্বর দে গুরুদয়াল দে ও শ্যামাসুন্দরী দম্পতির অনেক সাধনার ধন। কারণ, অনেক ছোট বয়সে বিয়ে হলেও আটাশ বছর বয়স পর্যন্ত শ্যামাসুন্দরী নিঃসন্তান ছিলেন। কথিত আছে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে পাশের গ্রামের শিবমন্দিরে গিয়ে পূজা দিয়ে শ্যামাসুন্দরী এ সন্তান লাভ করেন। শুধু তাই নয়। এই পূজো দিয়ে ফুল ও বেলপাতা সংগ্রহ করে তা দিয়ে তাবিজ বানিয়ে শ্যামাসুন্দরী গলায় পরেন। আমৃত্যু ঐ কবচটি তিনি গলায় ধারণ করেছিলেন। এ কবচটির উপর তার বিশ্বাস এতটাই দৃঢ় ছিলো যে, বিভিন্ন অসুখবিসুখ বা আশির্বাদের ক্ষেত্রেও তিনি এ কবচটি ব্যবহার করতেন।

বিক্রমপুরের বানারী গ্রামে জন্মেও যজ্ঞেশ্বর দে ওরফে মুকুন্দদাস হলেন বরিশালের মুকুন্দদাস। মূলত মুকুন্দদাসের ঠাকুরদা নৌকার মাঝি ছিলেন। সে সময় বাংলার 'শস্য-ভাণ্ডার' হিসেবে খ্যাত বরিশাল নৌপথের ব্যবসাকেন্দ্র ছিলো। তাই ঢাকা-ফরিদপুরের লোকেরা জীবিকা নির্বাহের জন্য বরিশাল আসতেন। এদের অধিকাংশই ছোটখাট চাকরি, ব্যবসাবাণিজ্য অথবা নৌকার মাঝিমাল্লার কাজ করতেন। বরিশালের লোকেরা তখনো এ ধরনের কাজ করতো না। তেমন একটা আগ্রহীও ছিলো না। তারা চাষাবাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। চাকরির মধ্যে আদালত, ফৌজদারি প্রভৃতি অফিসের পিয়ন বা চাপরাশির কাজ বিক্রমপুরীদের একচেটিয়া ছিলো। তাই মাঝি বাবার সাথে মাঝেমধ্যে বরিশালে আসা গুরুদয়াল দে-কে বড় হয়ে বরিশাল আদালতে স্বল্প বেতনে আরদালীর চাকুরি পেতে তেমন কোনো বেগ পেতে হয়নি। আর্থিক সচ্ছলতা বাড়ানোর জন্য গুরুদয়াল দে বরিশালের আলেকান্দা এলাকায় একটি ছোটখাটো মুদি দোকান খোলেন। সর্বনাশা পদ্মার করাল গ্রাসে বানারী গ্রামের পৈতৃক ভিটেবাড়ি ভেসে গেলে গুরুদয়াল দে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে সপরিবারে বরিশালে স্থায়ীভাবে বসতি শুরু করেন। দুই ছেলে যজ্ঞেশ্বর দে (৭/৮) ও রমেশ চন্দ্র দে (৪/৫), এবং স্ত্রী শ্যামাসুন্দরীকে নিয়ে বরিশাল জিলা স্কুলের পশ্চিম পাশে একটি ছোট বাসা ভাড়া করেন। চাকুরি আর দোকানের আয়ে ছোট সংসারটি ভালোভাবেই চলে যাচ্ছিল।

বরিশাল জিলা স্কুলের পাশে বাসা থাকার সুবাদে বাবা গুরুদয়াল দে ছেলে যজ্ঞেশ্বর দে-কে প্রথমে পাঠশালায়, পরে জিলা স্কুলে ভর্তি করে দেন। সহপাঠীদের চেয়ে বয়সে বড় হওয়ায় যজ্ঞেশ্বর সেখানে পড়তে সংকোচ বোধ করে, পড়াশুনায় তেমন মন

বসাতে পারে না। স্কুল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি পিতাকে জানালে তিনি স্কুল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। তখন বরিশালে অপর একটি উল্লেখযোগ্য স্কুল ছিলো মহাত্মা অশ্বিনীকুমার প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন বিদ্যালয় বা বিএম স্কুল। তিনি ছেলেকে সেই স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন।

যজ্ঞেশ্বর এই স্কুলের প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হলেও পড়াশুনার চেয়ে সহপাঠ কার্যক্রমের প্রতি তার প্রবল ঝোঁক। স্কুলে অনুষ্ঠিত সঙ্গীতানুষ্ঠানে, অভিনয়, খেলাধুলা, শরীরচর্চা সব বিষয়েই যজ্ঞেশ্বর অনুষ্ঠানের মধ্যমণি। ১৭ বছর বয়সে শারদোৎসবের শোভাযাত্রায় গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে বরিশাল শহর প্রদক্ষিণ করে যজ্ঞেশ্বর যেদিন গান গাইলো সেদিনই সবাই বুঝেছিলো- এ ছেলে একদিন বড় হয়ে বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত করবে।

বিএম স্কুলের আদর্শ ছিলো 'সত্য, প্রেম, পবিত্রতা'। এখানে শুধু লেখাপড়াই নয়, দেশ ও দশের কল্যাণ ও মুক্তিতে নিয়োজিত থাকতো এ বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা। লেখাপড়ার পাশাপাশি 'বান্ধব সম্মিলনী', 'দরিদ্রবান্ধব সমিতি', 'বাল্যাশ্রম' প্রভৃতি জনহিতকর বিষয় নিয়েও এ-স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকরা নিয়মিত কাজ করতেন। এতো সুন্দর আবহে থেকেও যজ্ঞেশ্বর দে লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগী হতে পারেননি। তাই তার প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যার দৌড় ছিলো অষ্টম বা নবম বা কারো কারো মতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া পর্যন্ত। এ সময় তার বয়স ছিলো ১৯ কি ২০ বছর। ক্লাস-পালানো অন্যান্য ছেলেদের সাথে আড্ডা মেরে মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে বেড়ানো আর বাঁদরামি করাই ছিলো এদের কাজ। এ কারণেই তার উপাধি মিললো যজ্ঞাগুন্ডা। এ দুরন্ত দলটিকে দমন করতে পুলিশও হিমশিম খেতো।

এ সময় বরিশালে আর্শিবাদ হিসেবে এলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সিভিলিয়ন বিটসন বেল, যার নাম নিয়ে গির্জামহল্লায় এখনো টিকে আছে বেল ইসলামিয়া ছাত্রাবাস। তিনি একাধারে শাসক অন্যদিকে প্রজাবৎসল। সাদামাটা এই সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটটি বরিশালে যেমন অনেক জনহিতকর কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন তেমনি পথভ্রষ্ট বখাটে ছেলেদের সঠিক পথ নির্দেশনায় সমান পারদর্শী। তিনি লাইনচ্যুত মানুষকে শাস্তি বা ঘৃণা দিয়ে দূরে ঠেলে না দিয়ে তাকে লাইনে আনায় বিশ্বাসী ছিলেন। এ কারণে অত্যাচারী দমন, জনসেবা, দরিদ্রকল্যাণ, উৎপীড়িতদের রক্ষা, শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় মি. বেল-এর অগ্রণী ভূমিকা আজো বরিশালে সাক্ষী হয়ে আছে। এই যজ্ঞাগুন্ডার দলকে দমন করতে তিনি ডান্ডার পথ বেছে না নিয়ে নিলেন বন্ধুত্বের পথ। দোলযাত্রা ও হোলিউৎসবের পালাপার্বণে একদিন নগরবাসী অবাক হয়ে দেখলো নাটের গুরু যজ্ঞাগুন্ডার দলের সাথে বেল সাহেব মিশে গিয়ে রঙ খেললেন, তাদের আনন্দের সাথী হলেন। তার ভালোবাসার যাদুর কাঠিতে যজ্ঞাগুন্ডার দলের সবাই ঘরমুখো হলো। ক্রমে মি. বেল তরুণদের মধ্যমণি হয়ে উঠলেন। এ প্রসঙ্গে মুকুন্দ গবেষক জনাব বদিউর রহমান লিখেছেন:

> বেল সাহেব ক্রমে শহরের যুব-তরুণদের কছের মানুষ হয়ে উঠলেন। গঠন করলেন রিক্রিয়েশন ক্লাব। খেলাধুলা, আলাপ আলোচনা আড্ডার মধ্য দিয়েই চলতে থাকে শিক্ষা। ক্রমে উৎসাহী যুবকরা দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠল। বেল সাহেবও তাদের ছাড়লেন না। যোগ্যতানুযায়ী চাকরি দেবার ব্যবস্থা করলেন তরুণ যুবকদের। কেউ চাকরি পেল পুলিশে কেউ বা কেরানির, আর কেউ বা অন্য কোন কাজ। যাদের ভয়ে শহরের শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন তটস্থ, তারাই হলো ভদ্র শিষ্ট সুশীল সমাজ, সংসারী মানুষ।

সবাইকে চাকরি ও বিভিন্ন কাজের মধ্যে বাঁধলেও দুরন্ত যজ্ঞাগুন্ডাকে বেল সাহেব কোনো কাজের মধ্যে বাঁধতে পারলেন না। তবে যজ্ঞাগুন্ডার নামটা গুন্ডার খাতা থেকে ঝরে পড়ল। এবারে তিনি সব ছেড়ে বাবার মুদি দোকানে বেচাকেনা আর আড্ডায় মন দিলেন। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত তিনি এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এরপরই তিনি সুরের হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে শুরু করলেন। যোগ দিলেন বরিশালের নায়েব নাজির বীরেশ্বর গুপ্তের কীর্তনের দলের সঙ্গে।

এ সময় বরিশাল শহরের আলেকান্দায় যোগেশ পালের বৈঠকখানা কেন্দ্রিক একসেলসিয়র ক্লাবে যজ্ঞেশ্বরের যাতায়াত শুরু হয়। এখানে তিনি সংবাদপত্র পড়ার পাশাপাশি সাহিত্য আলোচনা করতেন এবং লিখতেনও, যা তৎকালীন *বরিশাল হিতৈষী* পত্রিকায় ছাপা হতো। আর এভাবেই তার ভেতরে দেশপ্রেমের বীজ উপ্ত হয়।

কীর্তনীয়া বীরেশ্বরের মৃত্যুর পর ভেঙেপড়া ঐ দলটি থেকে যজ্ঞেশ্বর নিজে একটি দল গঠন করে কীর্তনের সাথে একাত্ম হয়ে গেলেন। ক্রমে তার বেশভূষায় পরিবর্তন এলো। জামাজুতা দূর হয়ে নগ্নপদে সাদা পোশাক। আর সাদা উত্তরীয় হলো একমাত্র ফতুয়া। আর তার সঙ্গে চললো হেলেদুলে নানা অঙ্গভঙ্গিতে কীর্তন পরিবেশন। শত কীর্তনীয়ার মধ্যে যজ্ঞেশ্বর ক্রমে একক হয়ে উঠলেন। (বদিউর রহমান: বাংলার চারণকবি মুকুন্দদাস)

১৩০৭ বঙ্গাব্দ। কুড়ি বছরের যুবক যজ্ঞেশ্বর। দোকনে বসে কীর্তন নিয়ে মগ্ন। এক সময় সেখানে এক গোঁসাইজী এলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলে গোঁসাইজী তাকে ও তার বন্ধু রাজেন্দ্র সেনকে দীক্ষা দিলেন। যজ্ঞেশ্বরের মাথায় হাত দিয়ে তার নাম রাখলেন 'মুকুন্দদাস'। মুকুন্দ গবেষক শ্রীজয়গুরু গোস্বামী উক্ত তথ্য দিয়ে আরো জানান- 'মুকুন্দদাস গুরু রামদাস স্বামীকে প্রায়ই কীর্তন শুনাইতেন। রামদাস গানে খুব আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং অতিশয় প্রীত হইয়া একদিন বলিলেন, মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের পর্ষদের মধ্যে যিনি মহাপ্রভুকে কীর্তন শুনাইতেন তাহার নাম ছিল 'মুকুন্দ' তাহার গানে মহাপ্রভু বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। আমিও তোমার গান শুনিয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম। আজ হইতে তোমার নাম হউক 'মুকুন্দদাস' (মুকুন্দের দাস)।' এভাবেই যজ্ঞেশ্বর পরিণত হলেন মুকুন্দদাসে। মুকুন্দ শব্দের অর্থ মোক্ষদাতা, নারায়ণ। তাই মুকুন্দদাস হলেন নারায়ণের দাস।

ক্রমে মুকুন্দদাস তার সুললিত কণ্ঠে তুলে নিলেন স্বরচিত গান যার প্রতিটি ভনিতায় রয়েছে যজ্ঞেশ্বর নয়, মুকুন্দ নাম। দেড় বছরের মধ্যে ধর্ম, ধর্মের গোড়ামি, ধর্মের নামে অধর্মের কাহিনি দিয়ে তিনি প্রায় শতাধিক গান লিখলেন এবং নিজস্ব ভঙ্গিমায় দর্শক শ্রোতাকে শোনালেন। এভাবে তিনি বরিশালের থানা-মহল্লার কালীবাড়ির সুপ্রাচীন দেব মন্দির পাষাণময়ী কালী মন্দিরের পুরোহিত ও বংশানুক্রমিক স্বত্বাধিকারী শ্রী সনাতন চক্রবর্তী ওরফে সোনাঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন। এই মন্দিরে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত, আচার্য জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শারদানন্দ, রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্লামেন্ট সদস্য কেয়ার হার্ডি প্রমুখ আসতেন এবং দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করতেন। মুকুন্দদাস মন্দির চত্বরে বসে তাদের গান শোনাতেন। এদের সংস্পর্শে এসে বৈষ্ণব মুকুন্দদাস শাক্ত মুকুন্দদাসে পরিণত হলেন আর এর প্রভাব এতই প্রবল ছিলো যে, পরবর্তীতে কাশীপুরে তিনি যে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার বিগ্রহের আকৃতি কালী বিগ্রহের আদল থেকে সোনাঠকুরের আদল পেয়েছিলো। মূলত পাষাণময়ী কালী মন্দিরে এসে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের সাথে মুকুন্দদাসের পরিচয় এবং তারই বৈঠকখানার আড্ডায় প্রবেশাধিকার কবির ভেতরকার দেশপ্রেমের সুপ্ত চেতনার পালে হাওয়া বইয়ে দিলো।

১৯০৫ এর ২০ জুলাই লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্যকর হয়। এই বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য শুরু হয় তীব্র গণ-আন্দোলন। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত এ সময় উপলব্ধি করলেন যে, বাঙালির লোকজ সংস্কৃতি অতি সহজেই গণমনে স্বদেশ প্রেমের বীজ বপন করতে পারে। এ লক্ষ্যে ১৯০৫ সালে অক্টোবরে রাজাবাহাদুরের হাবেলীতে দেয়া এক বক্তব্যে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত বলেন, 'আমরা যে-সব বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছি তা যদি কেউ যাত্রা আকারে গ্রামে গ্রামে প্রচার করে তাহলে তা আমাদের এরূপ সভা বা বক্তৃতার চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর হবে।' অশ্বিনীকুমারের এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে *স্বদেশী* আন্দোলন আরম্ভ হতেই মুদির দোকানে বসে মুকুন্দদাস *মাতৃপূজা* নামে যে পালাটি লিখেছিলেন তাই নিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশমাতৃকার সেবায়। এ পালার মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইংরেজদের শাসন শোষণের রূপটি এমনভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, তা জানগনকে অতি সহজেই স্বাধীনতা ও মুক্তির চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলো এবং ব্রিটিশ সরকার পালাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলো।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে বরিশালের ভূমিকার ব্যাপকতা নিয়ে *Englishman* পত্রিকায় রেফারেন্স দিয়ে মুকুন্দ গবেষক জয়গুরু গোস্বামী লিখেছেন:

> বরিশালে ব্রিটিশ সম্ভ্রম বিলুপ্ত, যেখানে কোন বিদেশীর পক্ষেও কোন বিদেশী জিনিস কিনিতে হইলে নেতার আদেশ ছাড়া এক পয়সার জিনিস কেনার সম্ভাবনা নাই- ইত্যাদি। বরিশাল জেলায় মদের দোকান, বিলাতী বস্ত্র, লবণ প্রায় শূন্য অবস্থায়। সরকারী বিবরণ দৃষ্টে এক পক্ষের রোষ এবং অপর পক্ষের হর্ষ, সংবাদপত্র ও ভারতীয় জনসাধারণের আলোচ্য বিষয় হইয়াছিল, শুধু ভারতে নয়, বিলাতী কাগজ ও তত্রত্য অধিবাসীদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করিয়াছিল। তৎকালীন ভারত সচিব লর্ড মার্লি বড়লাট লর্ড মিন্টোকে এক গোপন পত্রে বরিশাল সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে মর্লি স্মৃতি পুস্তকে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই পত্রের মর্ম ছিল- আমরা উভয়েই এখন ভারতীয় সমস্যার সীমান্ত প্রদেশ ও বরিশাল নিয়াই চিন্তিত ইত্যাদি।

মুকুন্দদাস নিজের গানের পাশাপাশি শেকল ভাঙ্গার কবি কাজী নজরুল ইসলামের গান কবিতাকে যেমন কণ্ঠে তুলে নিয়েছিলেন তেমনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নাটকেও অভিনয় করেছেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার কাছেই মুকুন্দদাস গ্রহণযোগ্য ছিলেন। মুসলমান সম্প্রদায় কবিকে অত্যন্ত আপনজন বলে জানতেন। কোরবানির ইদে বিশাল মুসল্লি সমাবেশে মুকুন্দদাস সাদরে আমন্ত্রিত হয়ে কোরআন হাদিসের আলোকে কোরবানির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য দিতেন। এতে সবাই ত্যাগের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে ভালো কাজে আকৃষ্ট হতো।

ক্রমে মুকুন্দদাসের সুখ্যাতি সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৬ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তার মেয়ের বিয়েতে কবিকে কোলকাতায় আমন্ত্রণ জানান। কোলকাতায় এসে তিনি বিভিন্ন সংগঠনে ও অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির সামনে, সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এ সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট হলে তার সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। তার গান শুনে তৎকালীন প্রখ্যাত কবি প্রিয়ংবদা দেবী মঞ্চে উঠে এসে মুকুন্দদাসকে সোনার সেপ্টিপিন পরিয়ে দেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে আমন্ত্রণ জানালে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে তিনি যাত্রাপালা পরিবেশন করেন। কবিগুরু তার অভিনয়ে এতোটাই মুগ্ধ হন যে, তিনি মঞ্চে উঠে এসে মুকুন্দদাসকে আলিঙ্গন করে তাকে দেশ মাতৃকার খাঁটি সন্তান বলে আখ্যায়িত করেন। অন্যদিকে লেটোর দলের কবি কাজী নজরুল ইসলাম মুকুন্দদাসের গান শোনার জন্য নিজেই এসে তার সাথে দেখা করেন। গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তিনি মুকুন্দদাসকে এক বিরল উপাধিতে ভূষিত করলেন। তিনি বললেন- ''যাঁরা গান ও বক্তৃতা দ্বারা দেশের জাগরণ আনতে চেষ্টা করেন তারা সকলেই চারণ। আপনি, আমি, আমরা সবাই চারণ। তবে আপনি আমাদের সম্রাট অর্থাৎ চারণ সম্রাট''।

মূলত কোলকাতায় এসে মুকুন্দদাস চারণ কবি মুকুন্দদাস হলেন। কোলকাতায় মুকুন্দদাসের দেশাত্মবোধক পালার এই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তায় পুলিশ সচেতন হয়ে উঠলো এবং পুলিশ কমিশনার স্বয়ং মুকুন্দকে কলিকাতা ত্যাগের নির্দেশ দিলেন। মুকুন্দদাস দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করে বরিশাল ফিরে এলেন। বরিশাল এসে শহরের উত্তর প্রান্তে কাশীপুর মৌজায় বাড়ি করেন। কিন্তু কাশীপুরের সমাজের সাথে তিনি খাপ খাইয়ে নিতে পারলেন না। এ গ্রামের কায়স্থদের প্রথা অনুযায়ী সমাজে মিশতে হলে সমাজের সকলকে ভোজ ও সমাজপতিদের সেলামি দিতে হয়। মুকুন্দদাস ভোজ দিতে রাজী হলেও সেলামী দিতে রাজী হলেন না। ফলে তিনি সমাজের বাইরে রয়ে গেলেন।

দ্রোহ-বিদ্রোহের মূর্ত প্রতীক চাঁদ সওদাগরের দেশ বরিশালের মুকুন্দদাসকে ব্রিটিশের লাল চোখ কখনো দাবিয়ে রাখতে পারেনি। ১৯০৮ সালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে উঠলো। এ সময় অশ্বিনীকুমার দত্তসহ ন'জন রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিমে নির্বাসন দেয়া হয়। এতে মুকুন্দদাসের সংগ্রামী চেতনা আরো প্রবলভাবে জেগে ওঠে। তিনি তার মুক্তির গান, জাগরণের গান নিয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলেন। যেখানে তার অনুষ্ঠানে নিষেধাজ্ঞা আসতো সেখান থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতেন। পুলিশও তার পিছু নিতো। তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি করলো। অবশেষে ১৩১৫ বঙ্গাব্দে ১লা অগ্রাহায়ণ (১৯০৯ খৃ.) উত্তর শাহবাজপুরে গভীর রাতে নদীতে নৌকায় সদলবলে গ্রেফতার হলেন মুকুন্দদাস। *মাতৃপূজা* পালার তিনটি ছত্রকে রাষ্ট্রদ্রোহী বিবেচনা করে কবির বিরুদ্ধে ১০৯ ধারায় মামলা দায়ের করে তাকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু পরের দিনই তিনি জামিন পেলেন। এর কদিন পরই ৭ পৌষ জামিনে থাকা অবস্থায় মুকুন্দদাস *দেশের গান* সংকলন প্রকাশ করার অভিযোগে ১২৪ ধারায় আবারো গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ কবির দু'হাত একত্র করে হাতকড়া পরিয়ে সদর রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে কোর্টে নিয়ে যায়। উদ্দেশ্য জনগণকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার পরিণতি দেখানো। এ-সংকলনটির প্রকাশক ছিলেন কবির ছোট ভাই রমেশ চন্দ্র দে ও মুদ্রক ছিলেন নিবারণ মুখোপাধ্যায়। যথারীতি এরাও একই অভিযোগে গ্রেফতার হন। সেদিন কবির পক্ষে কোনো আইনজীবী দাঁড়াতে সাহস পেলেন না। কবি নিজেই কোর্টে সময় প্রার্থনা করলে তা মঞ্জুর হয়। কোর্ট থেকে জেলখানায় হেঁটে যাবার পথে তিনি উকিলদের ভৎর্সনা করে গেলে জনগনের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এর প্রেক্ষিতে ভোলার দুই আইনজীবী নবীন চন্দ্র দাশগুপ্ত ও শরৎচন্দ্র সেন (পরবর্তীতে পূর্ণান্দ মহারাজ) কবির পক্ষ হয়ে বরিশালে যাদবচন্দ্র রায়কে এই মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন। পরে অবশ্য আরো অনেক উকিল ভয় কাটিয়ে কবির পক্ষে দাঁড়ান।

এই মামলায় কবির তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও তিনশত টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। ছোট ভাই রমেশ চন্দ্রের ছ'মাস এবং মুদ্রক নিবারণ মুখোপাধ্যায়ের চার মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। দেশের গান সংকলনের একটি মাত্র গানের জন্য এ শাস্তি দেয়া হয়েছে বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়। গানটি হলো-

বাবু বুঝবে কি আর ম'লে!
কাঁধে সাদা ভূত চেপেছে, একদম দফা সারলে।
খেতে ভাত সোনার থালে, -
নাউ সেটিসফাইড স্টিলের থালে,
তোদের মতো মূর্খ কি আর দ্বিতীয়টি মেলে।
পমেটম লাইক করলি, দেশী আতর ফেলে-
সাধে কি আর তোদের দেয় রে গালি,
ব্রুট ননসেন্স ফুলিশ বলে।
ছিল ধান গোলাভরা শ্বেত ইঁদুরে করল সারা
চোখের ঐ চশমা জোড়া, দেখনা তোরা খুলে।
কূল নিয়েছে, মান নিয়েছে, ধান নিতেছে কলে
ডু ইউ নো বাঙ্গালী বাবু ইউর হেড ফিরিঙ্গীর বুটের তলে।
মুকুন্দের কথা ধর, এখনো সামলে চল,
সাহেবি চালটি ছাড়, যদি সুখ চাও কপালে।

জেলখানায় মুকুন্দদাসকে পাচকের কাজ দেয়া হলো। সেখানে বসেও কবি কয়েদিদের দেশপ্রেম ও আত্মজাগরণের গান শোনালে কয়েদিদের মধ্যে নবচেতনার সঞ্চার ঘটে। এতে ব্রিটিশ সরকার চিন্তিত হয়ে তাকে দিল্লী জেলে স্থানান্তর করে।

১৯১১ সালের মার্চ মাসে (বাংলা ১৩১৭) কবি কারাগার থেকে মুক্তিপান। জেল থেকে বের হয়ে তিনি জানতে পারেন তার কারাভোগের দেড় বছরের মাথায় তার স্ত্রী শতদল বাসিনী ১১ মাসের শিশু সন্তান কালীপদ দাসকে রেখে কলেরা রোগে মৃত্যুবরণ করেন। জরিমানার টাকা আর মামলার খরচ জোগাতে বিক্রি হয়ে গিয়েছে মুকুন্দদাসের সব মেডেল ও দোকান। এমন দুর্বিসহ পরিস্থিতিতেও মুকুন্দদাস ভেঙে পড়লেন না। সব প্রতিকূলতা দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করে অশ্বিনীকুমার দত্ত ও শরৎচন্দ্র গুহের সহায়তায় তিনি আবার মুদির দোকান খুললেন। ব্যবসায় কিছুটা সাফল্য এলে দোকানের দায়িত্ব ছোট ভাইয়ের হাতে দিয়ে তিনি কলিকাতায় চলে যান। সেখানে তিনি বিভিন্ন যাত্রাপালা ও থিয়েটার দেখে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নতুন দল গঠনের উদ্দেশ্যে বরিশাল ফিরে আসেন। এ সময় ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী তার গহনা বন্ধক রেখে কবিকে দল গঠনে সাহায্য করেন।

এই একই বছরে তিনি গিরীশচন্দ্রের *বলিদান* নাটকের যাত্রারূপ দেন *সমাজ* নামে (১৯১১ -১২)। এরপর তিনি লেখেন *কর্মক্ষেত্র* (১৯১৫ - ১৬)। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বাণী প্রচার, কর্মমুখী নারী শিক্ষার প্রেরণা, স্বদেশী পণ্য ব্যবহার ও বিদেশী পণ্য বর্জনের আহ্বানের কারণে ১৯৩১ এর ভারতীয় প্রেস জরুরি ক্ষমতা আইনের ১৯ নং ধারাবলে *কর্মক্ষেত্র* পালার প্রথম সংস্করণ এবং ১৯৩২ এর ২০ এপ্রিল প্রকাশিত গেজেটের মাধ্যমে এর ২য় ও ৩য় সংস্করণ নিষিদ্ধ হয়। তিনি এরপর লেখেন *পথ* (১৯৩১) পালাটি। ১৯৩২ এর ১২ নভেম্বর প্রকাশিত গেজেটের মাধ্যমে এটিও বাজেয়াপ্ত হয়। মুকুন্দদাস অবশ্য বসে থাকেননি। তিনি একে একে লিখেন *ব্রহ্মচারিণী*(১৯২৬), *পল্লীসেবা*, *সাথী*, *দাদা*, *জয়পরাজয়*, ও *আদর্শ*। শেষের চারটির কোনো কপি পাওয়া যায়নি।

১৯৩১ সালে মুকুন্দদাস শারীরিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। ১৯৩২ সালে তার চারটি বই নিষিদ্ধ হলে তিনি আর্থিক, মানসিক ও শারীরিক ভাবে আরো দুর্বল হয়ে পড়েন। আর্থিক অনটনের কারণে শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তার ৩০ জন সহকর্মীর কথা ভেবে মুকুন্দদাস বায়না নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পালা করেছেন। ১৯৩৪ সালে এমন এক বায়নায় তিনি কলিকাতার ১০নং গোপাল নিয়োগী লেনের একট বাসা ভাড়া নিয়ে তার কাছাকাছি জায়গায় গান গাইতেন। এ-বছর ১৭মে এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে রাত ১২টার বাসায় ফেরেন এবং গভীর রাতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার পরের দিন অর্থাৎ ১৮মে বাংলা ১৩৪১ এর ৪ জ্যৈষ্ঠ রোজ শুক্রবার সবার অজ্ঞাতে চারণ সম্রাট মুকুন্দদাস মাত্র ৫৬ মতান্তরে ৫৮ বছর বয়সে চির বিদায় নিলেন। "এভাবেই বাংলার আকাশ থেকে ঝরে গেলো অসাম্প্রদায়িক, সংস্কারমুক্ত মুক্তিপাগল এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। আর মুক্তিকামী মানুষের হৃদয়ে অমর হয়ে রইলেন- 'বান এসেছে মরা গাঙ্গে খুলতে হবে নাও', 'সকল কাজের মিলবে সময় আগে দু'টি ভাতের জোগাড় কর', 'রাম রহিম না জুদা কর ভাই- মনটা খাঁটি রাখো জি' এবং 'ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে' গানগুলোর মতো আরো অনেক গানের অমর স্রষ্টা"(আলমগীর মালেক: মুকুন্দ দাসের গান স্বরলিপি)।

এবারে চারণ কবি মুকুন্দদাসের যাত্রা প্রসঙ্গ। "ভারতবর্ষে আগে জ্ঞানীমাত্রকেই 'কবি' বলা হত, শাস্ত্রবেত্তারা কবি, দর্শন শাস্ত্রকারও কবি, জ্যোতিষ শাস্ত্রকারও কবি। আবার মধ্যযুগে ষোড়শ শতকের সবচেয়ে জীবনবাদী কবি, কালকেতু-উপাখ্যান খ্যাত কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক ঔপন্যাসিকদের অগ্রদূত বলা হয়। আঠারো শতকের শেষ লগ্নে আমরা আরেকজন জীবনবাদী কবির সাক্ষাৎ পাই। তিনি চারণ কবিদের সম্রাট মুকুন্দদাস।" কথাগুলো বলেছেন সরোয়ার আলম সৈকত প্রথম আলোর ১১ মে ২০০৭ সংখ্যার একটি নিবন্ধে।

একজন লেখক যখন রাজনৈতিক ও সমাজসচেতন হন তখনই তিনি জীবনবাদী হতে পারেন। জীবন-সম্পৃক্ত নয় এমন লেখা কখনোই পাঠক বা দর্শক-মনে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। আর সাধারণ মানুষ এবং তাদের চাওয়া-পাওয়া, তাদের সমাজ, জীবনযাত্রাকে না বুঝতে পারলে কখনো সাধারণ মানুষের কাছাকাছি আসা সম্ভব নয়।

পূর্বের আলোচনায় যজ্ঞেশ্বর দে'কে পেয়েছি 'যজ্ঞাগুন্ডা' হিসেব, পেয়েছি 'মুকুন্দদাস' রূপে, আরো পেয়েছি চারণসম্রাট রূপে। দেখেছি যাত্রাপালা নিয়ে বাঙলার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে দৌড়ে বেড়াতে; ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যাত্রাগান শুনিয়ে কারাবরণ করতে, অভাবের তাড়নায় জীবনের প্রয়োজনে অসুস্থ শরীর নিয়ে যাত্রাপালা করতে। অন্যদিকে তার কর্মময় জীবনের সূচনা হয়েছে ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন কালে। সংস্পর্শে এসেছেন মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত, সোনাঠাকুর, আচার্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সারদানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্লামেন্ট সদস্য কেয়ার হার্ডি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের মতো তৎকালীন আরো অনেক মহান ব্যক্তিত্বের। তাই তার লেখায় সেই সময়কার রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার জাগরণের পাশাপাশি সমাজের কুপ্রথার চিত্র ফুটে ওঠাই স্বাভাবিক। মাটির কাছাকাছি এ মানুষটি সাধারণ জীবনের সাথে জীবনের যোগ করেছেন। তাই তার প্রতিবাদের মূল অস্ত্র যাত্রাপালাগুলো ছিলো গণমুখী ও জীবনবাদী।

১৯১১ সালে মুকুন্দদাস তিন বছরের কারাভোগ করে যখন ঘরে ফিরে জানতে পারলে তার প্রিয়তমা স্ত্রী শতদল বাসিনী এগারো মাসের শিশু সন্তান রেখে পরপারে চলে গেছেন, মামলা আর জরিমানার টাকা জোগাড় করতে বাবা হারিয়েছেন দোকান; শুধু তাই নয়, বিপ্লবী সন্তানের পিতা হবার অপরাধে সরকার কেড়ে নিয়েছে তার চাকরিটিও; তখন দিশেহারা মুকুন্দদাস মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত, শরৎচন্দ্র গুহের সহায়তায় আবারো চালু করলেন বাবার মুদির দোকানটি। কিন্তু দেশপ্রেমিক কবিকে কি আর একস্থানে বসিয়ে রাখা সম্ভব? তিনি দোকানের দায়িত্ব ভাইকে দিয়ে কলিকাতায় চলে গেলেন। সেখান থেকে যাত্রাপালা ও থিয়েটারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফিরে এলেন বরিশাল। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীর আর্থিক সহায়তায় খুললেন যাত্রাদল। *সমাজ* যাত্রাপালা দিয়ে শুরু হলো এ-দলটির যাত্রা। গিরীশচন্দ্রের *বলিদান* নাটকের আদলে লেখা *সমাজ* (১৯১১-১২) যাত্রাপালাটি কন্যাদায়গ্রস্ত এক অসহায় ব্রাহ্মণ পিতার করুণ আর্তি দিয়ে শুরু হয় এবং শেষ হয় মিলনাত্মক পরিণতির মাধ্যমে। মূল *বলিদান*-এ শেষ ছিলো বিষাদাত্মক।

কন্যাদায়গ্রস্ত তিন কন্যার পিতা কামিনী মুখুজ্যের বড় কন্যা সর্বগুণে গুণান্বিতা সরোজকে বিয়ে দিলেন মা-বাবার বখে যাওয়া এন্ট্রান্স পাস ছেলে বিনোদের সাথে। ছেলেটি লম্পট ও দুশ্চরিত্র, মদ ও বেশ্যাসক্ত জেনেও কামিনী মুখুজ্যে মেয়েকে সমাজের ভয়ে এক হাজার টাকা নগদ, সোনা, রূপা, চেইন, ঘড়ি, খাট, বিছানা ও আরো অনেক কিছু যৌতুক দিয়ে বিয়ে দিতে বাধ্য হন। সমাজে আইবুড়ো মেয়ে ঘরে থাকা নিন্দনীয় অপরাধ। যদিও ছেলের মা কালী ছেলের দাম দু'হাজার টাকা নগদ, দু'শো ভরি সোনা, একখানা বাড়ি লিখে দিতে ঘটককে জানায়। কিন্তু ছেলে বিনোদ সরোজকেই বিয়ে করবে বলে জানিয়ে দেয়। বিয়ের পর যৌতুকের সমস্ত টাকা বিনোদ ফূর্তি করে উড়িয়ে দেয়। এদিকে শ্বশুর বাড়ির অত্যাচারে টিকতে না পেরে সরোজ বাবার বাড়ি চলে আসতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয় না। নগদ টাকা ফুরানোর পর স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে পতিতালয়ে গিয়ে ফূর্তি করবে বলে সে সরোজের কাছে এসে গহনা দাবি করে। কিন্তু তার গহনা আগেই বিনোদের মা নিয়ে নিয়েছে জেনে বিনোদ ক্ষুব্ধ হয়ে স্ত্রী ও তার পরিবারকে গালিগালাজ ও অভিশাপ দিয়ে যায়। কামিনীর মেঝো মেয়ে নির্ম্মলা। বড় মেয়েকে বিয়ে দিতে গিয়ে নিঃস্ব হওয়া অসহায় বাবা এ মেয়েটিকে ষাট বছরের রোগা ঘাটের মড়া বিবাহযোগ্য দু'ছেলের বাবা বুড়ো শশীর সাথে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়। কারণ, এখানে যৌতুক লাগবে না। বিয়ের দু'দিনের মধ্যে নির্ম্মলা বিধবা হয়ে বাড়ি ফিরে এলে শোকবিহ্বল

নিরুপায় বাবা ক্ষুধার্ত মেয়েকে উনুন থেকে ছাই এনে বাপ মেয়ে দুজনে একত্রে খাবার কথা বলে। একথা শুনে শোকেদুঃখে অভিমানে নির্ম্মলা পুকুরে ঝাঁপ দেয়। একদিকে কন্যার আত্মহত্যা অন্যদিকে দেনার দায়ে কোর্ট নোটিশ কামিনীকে দিশেহারা করে তোলে। মেয়ের আত্মহত্যার জন্য সে নিজেকে দায়ী মনে করে আত্মহত্যা করতে চায়, কিন্তু মাথার ওপর আরো একটি মেয়ে রয়েছে। এহেন বিপর্যস্ত অবস্থায় কাহিনির নিয়ামক পালার বিবেক চরিত্র সত্য কামিনীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়ায়। সমাজ সংস্কারক সত্য পূর্বে কামিনীর পদক্ষেপগুলোতে বাধা দিলে তাকে পাগল বলে আখ্যায়িত করে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো। (সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ালে পাগল পদবীটাই প্রাপ্য)। সত্যের অনুসারীরা কন্যা নির্ম্মলাকে পুকুর থেকে উদ্ধার করে আশ্রমে ঠাঁই দেয়। তারই নির্দেশে ছোট মেয়ে প্রমিলাকে যৌতুক ছাড়া বিয়ে করতে এগিয়ে আসে ধনী গৃহস্থ শরৎ চ্যাটার্জির এম. এ. পাস ছেলে নগেন। নগেন সত্যের উপদেশ মতো যৌতুক ছাড়া প্রমিলাকে বিয়ে করতে চাইলে বাবা আপত্তি করেন। কারণ, তিনি ঘটক মারফত দু'টি সম্বন্ধ পেয়েছেন যেখানে নগদ পাঁচ হাজার টাকা করে যৌতুক পাওয়া যাবে। নগেন এগুলো প্রত্যাখ্যান করে কামিনীর বাবুর মেয়ে প্রমিলাকেই বিয়ে করবে বলে জানালে তার বাবা মেয়ের বিয়েতে খরচ হওয়া টাকা ছেলের বিয়েতে যৌতুক নিয়ে পুষিয়ে নেবার কথা জানায়। কিন্তু শিক্ষিত ছেলে নগেনের যুক্তির কাছে হেরে গিয়ে তারা শুধু যৌতুক ছাড়াই নয় বিয়ের খরচ বাবদ কামিনীর হাতে কিছু নগদ অর্থও তুলে দেয়। অন্যদিকে সর্বস্ব হারিয়ে ভুল বুঝতে পেরে বড় জামাই বিনোদ সত্যের শরণাপন্ন হয়। সত্য তাকে সংসারে ফিরে যাবার উপদেশ দিলে নগেন স্ত্রীর কাছে ফিরে আসে এবং শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে ক্ষমা চায়। কামিনী মুখার্জির সংসার আবার পূর্ণ হয়ে ওঠে। এখানেই *সমাজ* যাত্রাপালার কাহিনির পরিসমাপ্তি।

সমাজ যাত্রাপালার মূল কাহিনি এমনটি হলেও লেখক মাঝেমধ্যে মূল কাহিনি থেকে সরে গিয়ে মানব জীবনের আদর্শ, কর্তব্য, কলেরাক্রান্ত মেথর বালকের শুশ্রূষা, শ্রী চৈতন্যের আদর্শের অনুপ্রেরণা, অষ্টপাশ থেকে মুক্ত হয়ে ভক্তি সাধনা করা, দেশে প্রচলিত জগজ্জননীর পূজা প্রণালীর পরিবর্তন করা, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর কৃষ্ণসেবায় ভ্রান্ত ধারণা, মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তির পরিণাম, মোহ ও আঁধার ঘোচাবার জন্য মায়ের নামকীর্তন দৃশ্য (নাটকের সমাপ্তি) এ ধরনের সামাজিক বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে। তবে বিষয়গুলো মূল কাহিনির সাথে অপ্রাসঙ্গিক হলেও লেখক এ-সমস্ত প্রসঙ্গ টেনে অন্ধ সমাজের চোখ খুলে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন।

পালায় লেখকের বাস্তবতাবোধের পরিধিকে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ করেছে তার চরিত্রচিত্রণ কৌশল। দেশে বিরাজমান বাস্তব পরিবেশের প্রেক্ষিতে সংস্কারাচ্ছন্ন জনজীবনকে সচেতন করার লক্ষ্যে লেখা এ *সমাজ* যাত্রাপালাটিতে মূল চরিত্র কামিনী মুখুজ্যে। অন্যান্য প্রধান চরিত্র বিনোদ, শরৎ চ্যাটার্জী, নগেন, কালীতারা, নলিনী; পার্শ্ব চরিত্র দীনেশ, সরোজ, নির্ম্মলা, শশীবাবু, প্রমিলা, লক্ষ্মী (চরিত্র পরিচিতি পর্বে প্রমদা নাম উল্লেখ করা হয়েছে) এবং পরিপ্রেক্ষিত চরিত্র মেথর, মুদী, চাকর, সেবক, বৈষ্ণবগণ, ঘটক, পুরোহিত, শশী, প্রতিবেশিনী, ঝি, মেথরানী ও বৈষ্ণব প্রত্যেকেই স্ব স্ব মহিমায় উজ্জল। সর্বোপরি রয়েছে যাত্রার বিবেক বা নিয়ামক চরিত্র 'সত্য'। *সমাজ* যাত্রাপালাটির পরিচিতি পর্বে লেখক এর সব পুরুষ চরিত্রকে নায়ক এবং নারী চরিত্রকে নায়িকা বলে উল্লেখ করেছেন।

সমাজ যাত্রাপালার কেন্দ্রীয় চরিত্র কামিনী মুখাজ্যে একজন অসহায় কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তিন কন্যার পিতা কামিনী মুখুজ্যে সমাজের আইবুড়ো কন্যার দায় ও যৌতুক প্রথার শিকার। কাহিনির ২৪টি দৃশ্যের মধ্যে ১১টি দৃশ্যে তার উপস্থিতি। কাহিনির শুরুতেই দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই অসুস্থ কামিনীকে বড় কন্যা সরোজ সারারাত জেগে বাতাস করলেও অসহায় পিতা তার মৃত্যু কামনা করে। কেনো? কামিনীর সংলাপেই শোনা যাক:

> মেয়ে হয়, কিন্তু এমন স্নেহের পুতলী কার কার আছে বল, আমার মুখ ভার দেখলে তার চোখে জল আসে, এ রত্ন আমি কার ঘরে বিলিয়ে দেব? উঃ, দুনিয়ার টাকা কি আজব জিনিস! টাকা নেই অথচ আমি নিজে কুলীন, একটু বংশজে নেমে যদি মেয়ের বিয়ে দেই, তাহলে কি সমাজ আমায় দেশে রাখবেন? সমাজ বলেন, জাত যাবে, কথা উঠবে নাক সেটকান, এ দিকে যে ঘরে ঘরেই বিপদ, তা সমাজ একবারও ভেবে দেখছে না। ধিক এমন নচ্ছার সমাজের, ধিক আমার কুলীনত্বে।

দেড়শ টাকা বেতনের এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক হাজার টাকা নগদ এবং সোনা, রূপা, চেইনসহ ঘড়ি, খাট-বিছানা প্রভৃতি দিয়ে বড় মেয়ে সরোজকে লম্পট বিনোদের সাথে বিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হন। বলা বাহুল্য এ সবই দেয়া হয়েছে ধারদেনা করে। লম্পট বিনোদ আর লোভী কালীতারা সরোজের টাকা গহনা হাতিয়ে নিয়ে তারপর মারধর করে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। আকণ্ঠ ঋণে ডোবা কামিনী দ্বিতীয় কন্যাটিকে বিয়ে দেন ঘাটের মড়া বিবাহ যোগ্য দুই ছেলের বাবা শশীর সাথে বিনা যৌতুকে। কিন্তু অচিরেই নির্ম্মলা বাবার বাড়ি ফিরে আসে বিধবার বেশে।

একদিকে পাওনাদারের আদালতে যাবার হুমকি- অন্যদিকে কন্যা নির্মলার বিধবা বেশে বাবার বাড়ি প্রত্যাবর্তন, তার উপরে ঘরে আরো একটি বিবাহযোগ্য কন্যা, সব মিলিয়ে কামিনী দিশেহারা হয়ে পড়লো। এক পর্যায়ে দুদিনের উপবাসী নির্ম্মলা খেতে চাইলে কামিনী বলেন- ''আমিও উপবাসী, আমারও ক্ষুধা পেয়েছে, আর কিছু না পাও, মা, উনুন থেকে কিছু ছাই নিয়ে এসো, বাবা-মেয়ে দু'জনে একসঙ্গে বসে খাই। শুভক্ষণে সব জন্মেছিলে।"

এরপর সে সোজা বাড়ি বিক্রি করতে যায়। এক পর্যায়ে দিশেহারা উন্মাদপ্রায় কামিনী মেয়ে নির্ম্মলার শোকে এবং কোর্ট থেকে শমন এলে নিজেও আত্মহত্যায় উদ্যত হয়। কিন্তু সত্যের সহায়তায় তার সংসারে আবারো শান্তি ফিরে আসে।

মূলত *সমাজ* যাত্রাপালার কেন্দ্রীয় চরিত্র 'সমাজ' হলেও আষ্টেপৃষ্ঠে কুসংস্কারে আবদ্ধ সমাজের যৌতুক প্রথার ভয়াবহ দিকটি কামিনী মুখুজ্যেকে কেন্দ্র করেই ফুটে উঠেছে। কামিনী হতদরিদ্র নিম্ন শ্রেণির ব্রাহ্মণ পরিবারের সমাজ নির্যাতিত অসহায় স্নেহবৎসল পিতার প্রতিনিধি। আর তাই এহেন পিতৃচরিত্রের মুখে যে আক্ষেপ, যে সামাজ ধিক্কারের কথা উচ্চারিত হয়েছে তা জীবন্ত এবং বাস্তব।

কাহিনির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র যাকে এ-কাহিনির নিয়ামক বলা যেতে পারে- তাহলো 'সত্য'। যাত্রাপালার এই ভাবুক বা বিবেক চরিত্রটি যেনো বৈষ্ণব-শাক্ত কবি মুকুন্দদাসের প্রতিচ্ছবি। ২৪টি দৃশ্যের মধ্যে ১২টি দৃশ্যে তার সক্রিয় উপস্থিতি। সমাজের যেখানেই অন্যায় বা কুসংস্কার দেখেছেন সেখানেই এই সত্যের সরব উপস্থিতি ও প্রতিবাদ। কাহিনির তৃতীয় দৃশ্যে ঘটক, বিনোদ ও কালীতারার মধ্যে যৌতুক নিয়ে দরকষাকষির মাঝে সত্যের আগমন। এ-দৃশ্যে সত্যের হেয়ালীপূর্ণ পরিচয়ে তাকে পাগল বলে কালীতারা ও বিনোদ তাড়িয়ে দেয়।

বস্তুত সমাজের অসংগতি ও কুসংস্কারগুলো চোখে আঙুল দিয়ে তুলে ধরার হাতিয়ার হিসাবেও সত্য চরিত্রটি চিহ্নিত হয়েছে। তাই মূল কাহিনি থেকে সরে এসে এই সত্য চরিত্রটির মধ্য দিয়ে দরিদ্রবন্ধু সেবাসংঘ, সমাজ, মানবতা, সত্য-প্রেম-পবিত্রতা নানা বিষয় উঠে এসেছে। আর এখানে কাজ করেছে শিক্ষিত যুব-সামজ। এ-দৃশ্যগুলোয় সত্য পাগল নয়- গুরু। সপ্তম দৃশ্যে আমরা শাক্ত ও বৈষ্ণব সত্যের যে পরিচয় পাই তা যেনো মুকুন্দদাস স্বয়ং। শাক্ত কবি মুকুন্দদাস ধর্ম সর্ম্পকে নগেনকে জ্ঞান দিতে গিয়ে বলেন, 'যা কিছু দেখছ, বিশেষ করে চেয়ে দেখ, প্রত্যেক বস্তুর গায়ে লেখা আছে মায়ের নাম। মাকে যা বলে ডাক না কেন, মা তাতেই উত্তর দেন, তবে কিনা একটু ভক্তি চাই।' এর পর মা ন্যাংটা কেনো এবং এ দিয়ে তিনি কি শিক্ষা দিচ্ছেন এর জবাবে সত্য বলেন-

> মাকে নেংটা দেখে মনে করোনা মায়ের আমার কাপড় নেই। কুবের যাঁর ভাণ্ডার তার কাপড়ের অভাব কি? তবে মায়ের কাপড় পড়ার অবসর নেই। ... নেংটা থাকার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হচ্ছে জগৎবাসীকে শিক্ষা দেওয়া। ... মা নেংটা হয়ে জগৎকে বলছেন, 'দেখরে জগৎবাসী আমি যেমন নেংটা তেমন নেংটা না হলে আমায় পাওয়া যাবে না। ... মহাপুরুষরা সবাই নেংটা ছিলেন। বুদ্ধদেব নেংটা ছিলেন। শঙ্করাচার্য নেংটা ছিলেন, শ্রী চৈতন্যদেব নেংটা ছিলেন, ত্রৈলঙ্গাস্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী নেংটা ছিলেন, পরমহংসদেব নেংটা ছিলেন। বরিশালের কালিবাড়ীর সোনাঠাকুরও নেংটা ছিলেন। 'নেংটা' শব্দের অর্থ হচ্ছে অষ্টপাশ মুক্ত। শ্রীধাম বৃন্দাবনের দিকে তাকালেও দেখবে যতদিন ব্রজগোপীদের বস্ত্রহরণ না হলো, ততদিন পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে তাদের পতিরূপে লাভ করা হয়নি।

অন্যত্র বলেন, 'বৈষ্ণব হওয়া মুখের কথা নয়, বাবাজী! মালা গলে পরলেই আর তিলক কাটলেই বৈষ্ণব হওয়া যায় না। তুলসীদাস বলতেন-

> তিরান ভোখ্নে হরি মিলে তো
> বহুত মৃগী অজা
> স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে তো
> বহুত মিলতো খোঁজা
> দুধ পিক্নে হরি মিলে তো
> বহুত বৎস বালা
> মীরা কহে বিনা প্রেমসে
> না মিলে নন্দ লালা।

এভাবে সমাজে পূজা অর্চনার ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলো, বৈষ্ণবদের সাথে বৈষ্ণবীর ব্যাপারে বচসা ও তাদের ভুলভাঙা এবং ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যগত দিকগুলো তুলে ধরা হয়। মূল কাহিনি থেকে সরে এসে মুকুন্দদাস স্বয়ং সত্যের মুখ দিয়ে যৌতুক ছাড়াও সমাজে বিরাজমান এসব কুসংস্কার ও অন্যায়গুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। সত্য চরিত্রটি সম্পর্কে মুকুন্দ গবেষক বদিউর রহমান বলেন:

কথায় আর গানে তিনি মন্দকে ভাল করার, হতাশাগ্রস্তকে আশার আলো দেখানোর, মৃত্যুপথযাত্রীকে বাঁচিয়ে তোলার কঠিন কাজে সার্থক এক চরিত্র। সে সঙ্গে সমাজ, সমাজনীতি, সামাজিক অত্যাচার, সমাজের দুর্বলতা যেমনি তুলে ধরেছেন দর্শক শ্রোতার সামনে তেমনি আঁধার কাটিয়ে আলোর সন্ধান দিয়েছেন। আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিয়ে সত্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মানবতার অমোঘবাণী উচ্চারিত হয়েছে সত্যের সংলাপে, মানব সেবাই মানে মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। এ মানব সেবা কেবল বাঁচিয়ে রাখার সেবা নয়। সত্যের জবানীতে এ মানব সেবা যার খাবার নেই তার দুটি অন্নের সংস্থান করে দেওয়া, রোগীর সেবা করা, অর্থাভাবে যে সকল ছেলেরা লেখাপড়া করতে পারে না, তাদের সেইজন্য কিছু সাহায্য করা (দৃশ্য-৪)। কেবল কথায় নয় সত্য 'দরিদ্রবন্ধুসভা' এবং আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সাংগঠনিকভাবে সেবার পথ দেখিয়েছেন এবং অন্যকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমাজে এক শ্রেণির বাবুর উদ্ভব হয়- যারা কাঁচা টাকার, কেউ-বা দু'পাতা ইংরেজি শেখার অহংকারে মদ-নারী জুয়া-নিয়ে মত্ত থাকতো। প্যারীচাঁদ মিত্র তার *আলালের ঘরের দুলাল*, মাইকেল মধুসূধন দত্ত তার *একেই কি বলে সভ্যতা* গ্রন্থে এবং এছাড়াও এ সময়ের আরো অনেক লেখকই এই বাবু চরিত্র নিয়ে লিখেছেন। মুকুন্দদাসের *সমাজ* থেকেও এ চরিত্রটি বাদ যায়নি। কামিনীর বড় জামাই বিনোদ এমনই এক চরিত্র। এন্ট্রান্স (এসএসসি) পাস করা বিনোদ মদ ও নারীতে আসক্ত। কথায় কথায় হিন্দী ও ইংরেজি বলে। যাত্রা পালার তৃতীয় দৃশ্যে সত্যকে যখন সে 'এইও Damn নিকালো হিঁয়াসে,

ক্যা মাংতে হিঁয়া?' বলে তখন সত্য জবাব দেয়- 'আরে বাপরে ভাষার আর বাকি রাখলেনা দেখছি! একবারে সব বিদ্যায় এক কলম। অবাক করেছে, ভেবেছিলাম আমিই পাগল। এখন দেখছি আমার চেয়েও আছে।' আবার এই বিনোদই অষ্টম দৃশ্যে রাজপথে মদ্যপ অবস্থায় মেথর মেথরানীর সাথে বচসায় লিপ্ত হলে এক পর্যায়ে চেয়ারম্যানের কাছে নালিশ করবে বললে তার জবাবে মেথর বলেন-

> চেয়ারম্যানকে পাস রিপোর্ট দেকে ক্যা মজা দেখ লায়েঙ্গা বাবু? তুম ভি চলোগে হাম ভি চলেঙ্গে। বোলতা হ্যা দুনিয়াকো কাম করতা হ্যায়? কেয়া কাম করতে হো বাবু? দারু পিনা দুনিয়াকো কুছ কাম হ্যায়? রেন্ডী বাড়ী যানা দুনিয়াকো কুছ কাম হ্যায়? দুনিয়াকো কাম হাম করতে হে।

এরপর মেথর আরো জানায়, 'আমরা দুনিয়ার সেবা করি। আমরা যদি আজ কাজ না করি তবে শহরে রোগ ছড়িয়ে পড়বে, অনেক লোক মারা যাবে। তোমরা আমাদের ঘৃণা করো, এটা লজ্জাকর। এখনও সাবধান হও! তুই ছোট আমি বড় একথা কখনও বলবেনা। কারণ সবাইকে প্রভু সৃষ্টি করেছেন।'

আবার দশম দৃশ্যে কপর্দকশূন্য বিনোদ শ্বশুড়বাড়ি এসে দাঁড়ায় এবং স্ত্রী সরোজের গহনা দাবি করে। সরোজ যখন জানায় যে, ওগুলো বিনোদের মা আগেই নিয়ে নিয়েছে, তখন বিনোদ সবাইকে গালি ও হুমকি দিলে কামিনী আক্ষেপ করে বলে- 'গিন্নি! দেখেছো কি? দুর্দান্ত মাতাল কোন বেশ্যার বাড়ি গিয়েছিল, সেখানে মদ খেয়েছে, এখন নেশার ঝোঁকে তার নাম করছে। ... গিন্নি! মনে করো সরোজ বিধবা; বিধবারও অধম, নচ্ছার-মাতালের স্ত্রী।'

এ হেন বিনোদ একবিংশ দৃশ্যে এসে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে সত্যের আশ্রমে এসে মুক্তির সন্ধান চায় আর শেষ পর্যন্ত ত্রয়োবিংশ দৃশ্যে কামিনী বাবুর বাড়িতে ছোট মেয়ে প্রমিলার বিয়ের সভায় স্ত্রী সরোজ, শ্বশুর ও শাশুড়ীর কাছে ক্ষমা চেয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে।

এর বিপরীতে অপর একটি শিক্ষিত চরিত্র নগেন। ধনীর দুলাল শরৎবাবুর পুত্র নগেন এমএ পাস ও উদার। সত্যের শিষ্য, সত্যের কাঙ্ক্ষিত মানবসেবার ব্রতে শিক্ষিত নগেন কোনো যৌতুক ছাড়াই কামিনী বাবুর ছোট মেয়ে প্রমিলাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। বাবা শরৎবাবু জানান, 'তার মেয়ের বিয়েতে যে যৌতুক দেয়া হয়েছে তা তিনি কোথা থেকে উসুল করবেন?' জবাবে নগেন বলেন, 'বানীর শ্বশুর আপনাকে পীড়ন করেছে বলে আপনি আর একজনকে পীড়ন করবেন? এই দোষেই দেশ উচ্ছন্নে যাচ্ছে। বড় বড় ঘর দেনাদার হচ্ছে, গৃহস্থ ফকির হচ্ছে, বালিকা হত্যা হচ্ছে। এই কন্যাদায়ে দেশের সর্বনাশ হয়ে গেল। কন্যার জন্ম ঘোর অমঙ্গল বলেই সকলে মনে করছেন।' এভাবেই নগেন বিভিন্ন রকমের যুক্তি দিয়ে মা বাবাকে যৌতুক ছাড়া বিয়েতে সম্মত করায়।

সমাজ যাত্রাপালার অপর একটি চরিত্র নগেনের বাবা শরৎ বাবু যিনি সামাজের প্রথামাফিক নিজের মেয়েকে যৌতুক দিয়েও মেয়েকে নির্যাতনমুক্ত করতে পারেননি। তাই পুত্র সন্তানের বিয়েতে মেয়ে পক্ষের কাছ থেকে সে টাকা উশুল করতে চায়। কিন্তু ছেলের যুক্তির কাছে হেরে গিয়ে তিনি শুধু যৌতুককে প্রত্যাখ্যানই করেননি বরং কন্যার বাবাকে বিয়ের খরচ বাবদ নগদ অর্থও দিয়েছেন। লেখক সমাজকে যেমন দেখাতে চেয়েছেন শরৎ চরিত্রটি তারই প্রতিচ্ছবি।

যাত্রাপালাটির বাকি চরিত্রগুলোর সংলাপ কম থাকলেও ঐ অল্প কথার মধ্য দিয়ে তারা আপন আপন মহিমায় উজ্জ্বল; যেমন কামিনীর স্ত্রী নলিনী, বিনোদের মা কালীতারা, ও নগেনের মা লক্ষ্মী। নলিনী স্বামীর অনুগামী, অনুসারী এবং নিত্যসঙ্গী। কন্যাদায়ের মর্মজ্বালায় প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী এ-নারী আপদে বিপদে আর দশটা বাঙালি স্ত্রীর মতো স্বামীর ছায়াসঙ্গী। কালীতারা অর্থলিপ্সু এক নারী। সে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের বর-মাতার মতো অহংকার, আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা, ছেলের বিয়েতে প্রাপ্য যৌতুকের খুত ধরা, বৌ-এর গহনা খুলে নেয়া, বৌ সম্বন্ধে কটুবাক্য উচ্চারণ করা, বৌকে ঘর থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করা দেয়া, এক কথায় অর্থ লিপ্সু, অহংকারী, দাজ্জাল শাশুড়ীর প্রতীক।

লক্ষ্মী শরৎ চ্যাটার্জীর স্ত্রী ও নগেনের মা। নিতান্ত সাদামাটা এই রমনী যৌতুকের ব্যাপারে মৃদু আবদার করলেও যুক্তির কাছে হেরে গিয়ে শুধু একটি দাবিই জানায় 'নগেনের বউটি যেন খুব সুন্দর হয়'। এ তো চিরন্তন বাঙালি মায়ের আবদার। এছাড়া সেবকগণ, বৈষ্ণবগণ, প্রতিবেশীসহ বাকি যে ১৩টি চরিত্র রয়েছে এ-যাত্রায় তাদের উপস্থিতি এবং সংলাপ তেমন না থাকলেও সমাজকে তুলে ধরতে এদের উপস্থিতি নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে। লেখক এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন সরোজের বিয়েতে যে যৌতুক দেয়া হয়েছে তাতে তুষ্ট না হয়ে শাশুড়ী ও স্বামী তাকে মারধর করে তাড়িয়ে দিতে চাইলে প্রতিবেশিনীরা বলেন-

> দেখ বিনোদের মা, তুমি কি মেয়ে মানুষ? আজ দুদিন ধরে মেয়েটাকে যন্ত্রণা দিচ্ছ। তোমার ঘটে এতটুকো আক্কেল নেই? এই মেয়ে যদি তোমার তাড়নায় মরে যায়- তবে যে হাতে দড়ি পরবে, তা কি ভেবে দেখেছ? তোমারই দাগা-সার ছেলে তাকে বিয়ে দিয়ে রাজরানী হবে ভেবেছ? রূপের ধুঁচনী, অন্ধকারে কথা কইলে ছেলেপিলে আতকে উঠে! এমন সোনার চাঁদ বউ পছন্দ হচ্ছে না? ভাবছ বউকে যাতনা দিয়ে আবার টাকা গুনবে? তা হচ্ছেনা, মায়ে পোয়ে থানায় গিয়ে কড়িকাঠ গুনতে হবে। হতচ্ছাড়ী, লক্ষ্মীছাড়া মাগী।

প্রতিবেশীদের এই সংলাপের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের যৌতুকের চরিত্রের পাশাপাশি আইনি ব্যবস্থার চিত্রও ফুটে উঠেছে। ঘাটের মরা বিবাহযোগ্য দুই ছেলের পিতা শশী চরিত্রের মাধ্যমে লেখক কাহিনিতে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে সমাজকে বিদ্রূপ

করেছেন। *সমাজ* যাত্রাপালায় চিত্রিত চরিত্রগুলো যথাযথ সংলাপ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজচিত্র ফুটিয়ে তুলতে সার্থক হয়েছে।

এ-ভূখণ্ডে যাত্রার ইতিহাস সুপ্রাচীন। প্রাচীনকালে দেবদেবী লীলা উৎসবে মুখরিত জনপদের *জঙ্গম* উৎসবের নাম *যাত্রা*। যাত্রার আদিরূপ হচ্ছে নাচ-গান-তামাশা সম্বলিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান। প্রথম দিকে এর কোনো লিখিত রূপ ছিলো না। উপস্থিতভাবেই কুশীলবরা অভিনয় করে যেতো। বৈদিক যুগে দেবদেবীকে কেন্দ্র করে যাত্রাপালা চলতো। বৌদ্ধযুগে রথ উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় রথযাত্রা। এরপর প্রচলিত হয় শৈব ও সূর্য্য পূজার। সে যুগের শীবোৎসব বর্তমানে গম্ভীরা বা গাজন উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ধর্মপ্রচার উপলক্ষ্য করেই যাত্রাপালা উদ্ভব হলেও দর্শক শ্রোতার চাহিদার দিকে তাকিয়ে ক্রমশ যাত্রার উদ্দেশ্য হয়ে উঠে ধর্মের মাধ্যমে লোকশিক্ষা ও আনন্দ পরিবেশন। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে যাত্রার বিষয়েও ধর্মের পাশাপাশি ঐতিহাসিক ঘটনাও চরিত্র স্থান করে নেয়। বলা বাহুল্য, যাত্রাপালার এ কাহিনিগুলো উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তৎকালীন সমাজচিত্র ফুটে উঠতো। তাতে থাকতো হাস্য কৌতুক, বিবেক (বালক) চরিত্র যে গান গেয়ে দর্শক শ্রোতাকে আনন্দ দিতো।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ার সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে প্রবাহিত হচ্ছিল। তদুপরি ১৯০৮ সালে শহীদ বীর ক্ষুদিরামের ফাঁসির আদেশ হলো। ইতোঃপূর্বেই মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে সমগ্র ভারতের ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-জনতা ব্রিটিশ শোষকের বিরুদ্ধে যূথবদ্ধ হচ্ছিল। মুকুন্দ কবি ঠিক ঐ মুহূর্তে আর পাঁচজন রাজনৈতিক নেতা বা শিল্পী সৈনিকের মতোই চারণ করে বেরিয়েছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। মুকুন্দ কবি সেবা, ঐক্যবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধের নতুন ইঙ্গিত নিয়ে স্বদেশী যাত্রাপালার-নবতর সৃষ্টির প্রবর্তন করেন। চারণ কবির এই নবতর সৃষ্টি স্বদেশী যাত্রায় (বিদেশে যাকে Sercular Drama বলা হয়) নবতর সংযোজন।

চারণ কবি এখানে স্বদেশী গীতির চারণ-শ্রেষ্ঠ ও রেনেসাঁর শ্রেষ্ঠতম কবি। তিনি নতুন দর্শনের দীপ্তিতে দেদীপ্যমান। সত্যানুসন্ধানের জন্য অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে স্বপ্নদ্রষ্টা ও ঋত্বিক। (মিহির দত্ত: ভারত বিচিত্রা; ঢাকা: ১৪শ বর্ষ ফাল্গুন-চৈত্র যুগ্ম সংখ্যা ১৩৯৪, ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ১৯৮৭)।

মুকন্দপূর্বে যাত্রায় শৃঙ্গার বা আদি, বীর, করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্র, ভয়ানক, হাস্য, বীভৎস ও শান্ত- এই নয়টি রসের নানা আঙ্গিকে উপস্থাপনের রীতির পাশাপাশি অভিনয়ের সময়সীমা ছিলো দীর্ঘ আট ঘন্টা। সন্ধ্যায় শুরু হতো আর ভোরে শেষ। মুকুন্দদাসে এসে দেখি সময়টা নেমে এসেছে ৩/৪ ঘন্টায় আর রসের উপস্থাপনাও হয়েছে সংক্ষিপ্ত। সমাজ, সমাজের মানুষ, মানুষের অভাব-অনটন, নানা সামাজিক সমস্যা, পরাধীনতার গ্লানি- সবই উঠে এসেছে দেশপ্রেমিক চারণ সম্রাট মুকুন্দদাসের রচনায়। আসর অনুযায়ী সংলাপ, বক্তৃতা, গান, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, হাস্যরসিকতা সবই মুকুন্দদাসের চিন্তার ফসল। আর এভাবেই তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত 'মাটির কাছাকাছি' এসে জীবনের সাথে জীবনের যোগ করেছেন। অন্য কথায়, Literature is the shadow of life- এর সার্থক রূপায়ন করেছেন। মুকুন্দ গবেষক বদিউর রহমান চারণ কবি মুকুন্দদাসের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন, 'বাংলা যাত্রার দীর্ঘ ইতিহাসে নানা পরিবর্তন বিবর্তন এলেও স্বদেশী যাত্রায় পরিবর্তন বিবর্তন নেই। অর্থাৎ মুকুন্দদাসের পরে এই পথে আর কেউ হাঁটেননি। ফলে এ একান্তই চারণকবি মুকুন্দদাসের 'স্বদেশ যাত্রা' হয়ে রইল, যার স্রষ্টা, প্রবর্তক, রূপকার, পরিবেশক, প্রচারক, অধিকারী, অভিনেতা ইত্যাদির একক এবং একমাত্র দাবীদার মুকুন্দদাস। এর কোন বিকল্প নেই, দ্বিতীয় নেই।'

১৯১১ সালে লেখা মুকুন্দদাসের *সমাজ* পালাটিতে কোনো অংকের বিভাজন নেই। টানা ২৪টি দৃশ্য রয়েছে। প্রথম দৃশ্য ঋষি বালকদের কালী বা শ্যামা সংগীত দিয়ে শুরু হয়েছে। এতে কাহিনি সংকেত বা প্রসঙ্গ কিছুই উত্থাপিত হয়নি। নিছকই কালী বন্দনা এবং শেষও হয়েছে চতুর্বিংশ দৃশ্যে শ্রী শ্রী কালী মন্দিরের কালীকীর্তনের মাধ্যমে। দ্বিতীয় দৃশ্যে কামিনী বাবুর বাড়ি এবং কাহিনির শুরু এখান থেকেই। এ-দৃশ্যে কামিনী নলিনীর আলোচনায় সমাজের কাছে দরিদ্র ব্রাহ্মণের অসহায়ত্ব ও কুসংস্কারগুলো ফুটে উঠছে। আর কিছু মুখোশধারী লোকদের কথা ও কাজের বৈপরীত্যের চিত্রও উচ্চারিত হয়েছে। তৃতীয় দৃশ্যে যৌতুকের উলঙ্গ রূপ দেখানো হয়েছে। বস্তুত: সমগ্র *সমাজ* যাত্রাপালাটিতে চতুর্থ ও সপ্তম দৃশ্যে ছাড়া বাকিগুলোতেই কামিনী বাবুকে ঘিরে তার অসহায়ত্ব ও প্রাপ্তির চিত্র পাওয়া যায়। চতুর্থ ও সপ্তম দৃশ্যে মূল কাহিনি থেকে সরে এসে মানবজীবনের কর্তব্য, শ্রী চৈতন্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া, 'অষ্টপাশ' মুক্ত হয়ে ভক্তি সাধনা করা, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর কৃষ্ণ সেবার ভ্রান্ত ধারণা ও নেশার পরিণাম প্রভৃতি আদর্শ মানবিক দিকগুলো স্থান পেয়েছে। প্রথম, চর্তুদশ, এয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ দৃশ্য চারটি খুবই ছোট। প্রথম দৃশ্যে ঋষি বালকদের কালী কীর্তন, চতুর্দশ দৃশ্যে পুকুর পারে নির্ম্মলার আত্মহত্যার সংলাপ এবং গানের মধ্য দিয়ে তার করুণ আকুতির প্রকাশ, এয়োবিংশ দৃশ্যে কামিনীবাবুর বাড়ীর বিবাহ সভায় প্রায় সভার উপস্থিতি এবং শুভ মিলন দিয়ে কাহিনির শেষ হলেও চতুর্বিংশ দৃশ্যে কালীমন্দিরে সত্যের নির্দেশে সবার কীর্তন গান দিয়ে কাহিনির সমাপ্তি টানা হয়েছে।

এর পরে আসা যাক *সমাজ* যাত্রাপালায় ব্যবহৃত সংগীত প্রসঙ্গে। এ-পালায় মোট ৩০টি গান ব্যবহৃত হয়েছে। গানগুলো ঋষি বালকদের, বৈষ্ণবদের, সেবকদের, সত্য বা ভাবুক, মেথর এবং নির্ম্মলার কণ্ঠে গাওয়া হয়েছে। মুকুন্দদাস এ গানগুলোর মধ্য দিয়েই মূলত তার বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন। তবে সব গান যে তার নিজের লেখা তা নয়। চৈতন্যদেব ও তুলসীদাসের একটি

করে এবং রজনীকান্তের গানের অনুকরণে একটি গান রয়েছে। পালার অষ্টম দৃশ্যে মেথর কণ্ঠে দু'টো গানের রচয়িতা সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। মুকুন্দ গবেষক বদিউর রহমান এ-ব্যাপারে বলেছেন- ''গান দু'টির রচয়িতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। এর ভাষা বিচিত্র, খিচুরি ভাষা বলা যেতে পারে।'' মেথর কণ্ঠে এ গান দুটো ভাষা, স্থান, কাল ও ব্যক্তি ভিত্তিতে বাস্তব ও যথাযথ হয়েছে। সমাজ যাত্রাপালাটিতে সত্যের কণ্ঠে ১৪টি, সেবকদের চারটি, হরিচরণ মেথর ও নির্ম্মলার কণ্ঠে দু'টি করে, ঋষি বালক, দীনেশ, সরোজ, প্রমিলা, বৈষ্ণব ও সমবেত কণ্ঠে ১টি করে মোট ৩০ টি গান রয়েছে। কাহিনির বিষয়বস্তুকে আরো স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে ব্যবহৃত এ-গানগুলো সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। যেমন, তৃতীয় দৃশ্যে তৎকালীন নব্য বাঙালি বাবু চরিত্র তুলে ধরতে গিয়ে মুকুন্দদাস রজনীকান্ত সেনের 'নব্য বাবু' শীর্ষক কবিতার অনুকরণে যে-গানটি ব্যবহার করেছেন তাতে যেমন সমাজে হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা নব্য বাঙালি বাবু চরিত্র ফুটে উঠেছে, তেমনি বাকি গানগুলোতে (৬টি শ্যামা সঙ্গিত বাদে) সমাজের করুণ চিত্রের পাশাপাশি এই অনাচারগুলো দূর করার আকুতি, দৃঢ় শপথ আর শক্তির সন্ধান মেলে। একাদশ দৃশ্যের গানে সমাজে বিরাজমান যৌতুকের যে চিত্র আমরা পাই তা হল:

স্বার্থ ছাড়া কথা কয়না
অর্থ ছাড়া কাজ করে না
দেখতে শুনতে রকমটি বেশ
চিনবার জো নাই বেশ
ছেলের বাপ বসে আছেন
পাঁচ হাজারের আশে
মেয়ের বাপের ভাঙ্গা কপাল
চোখের জলে ভাসে।

এর বিপরীতে উনবিংশ দৃশ্যে প্রমিলার কণ্ঠের গানটিতে ভেসে উঠেছে যৌতুক বিরোধী ব্যক্তিত্বের চিত্র:

থাকুক আমার বিয়ে
চাইনা আমি এমএ বিএ
কিনতে হয় যা টাকা দিয়ে
ছাগল গরুর মতন
যাদের ছেলের হাটে গিয়ে।
সোনার চেইন সোনার ঘড়ি
গর্ব্ব যাদের গলায় পরি,
অমন পশু কিনো না গো
টাকা কড়ি দিয়ে।
কুলীন চেয়ে ভাল কুলী
মুচি ডোম কশাইগুলো,
সারা জীবন ফেরে কেবল
ছুরি শানায়ে।

কামিনীর সমস্যা সমাধানের পর সমবেত কণ্ঠে সর্বমঙ্গলা কালীর কীর্তন দিয়ে যাত্রাপালাটি শেষ হয়।

মুকুন্দদাসের *সমাজ* যাত্রাপালাটি উপস্থিতভাবে যে কোনো স্থানেই মঞ্চায়িত করা যায়। কারণ এ-যাত্রায় পোশাক আশাকে যেমন কোনো বাহুল্য নেই তেমনি মঞ্চসজ্জা নিতান্ত সাদামাটা। পালা উপস্থাপনে তিনি দর্শক শ্রোতাদের স্থান, কাল ও রুচি বুঝে উপস্থাপন করতেন যাতে তার বক্তব্য সরাসরি দর্শক শ্রোতার মনে নাড়া দিতে পারে। তাদের সাথে একাত্ম হতে পারে।

মুকুন্দদাস এ-সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে হলে আগে সমাজে বিরাজমান কু-সংস্কার থেকে মুক্তি পেতে হবে তবেই মানুষের মধ্যে উদার ও সচেতন মুক্ত মনের জন্ম নেবে। তার প্রতিটি পালায়ই আমরা মানুষের মানবিকতা জাগ্রত করার প্রচেষ্টা দেখতে পাই। *সমাজ* যাত্রাপালাটির নামকরণ থেকেই এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সহজেই অনুমেয়। যাত্রাপালাটি স্থান উপযোগী সহজ-সরল ভাষা ও তৎকালীন সমাজে বিরাজমান যৌতুক প্রথা, বর্ণ-বৈষম্যের বিষয়গুলো কোনো রূপক উপমার ব্যবহার ছাড়াই সরাসরি তুলে ধরায় লেখক তার বক্তব্যের সাথে সমাজের বাস্তব চিত্রটিও তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

মুকুন্দদাস-কে বুঝতে পাশ্চাত্যের কোন মত বা দর্শনের চর্চা করতে হয় না। তিনি একান্তই বাংলার মাটির মানুষ। বাংলার কাদা-মাটি-বাতাসে বেড়ে ওঠা শুধু আমাদের ঘরের মানুষ। তার রচনার মাঝে বাঙালি মাত্রই একাত্ম হয়ে যায়। ব্যক্তিজীবন থেকে তিল তিল করে সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে মুকুন্দদাস *সমাজ* যাত্রাপালাটি লিখেছেন। যৌতুক তো আমাদের সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ক্যান্সারের বীজের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। আর বর্ণ-বৈষম্য কিছুটা কমে এলেও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। পালার চতুর্থ দৃশ্যের 'দরিদ্র বান্ধব সভা'টি মূলত বরিশাল বিএম স্কুলের শিক্ষক-ছাত্র সমন্বয়ে Little Brother for the Poor–এর অনুকরণে গঠিত। আর একই দৃশ্যে অসুস্থ মেথরের ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের জীবনের একটি ঘটনার অনুরূপ। সুরেশ চন্দ্রগুপ্তের লেখা 'ঋষিকল্পে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমারের জীবনী' থেকে জানা যায়, বরিশাল থানার

কাছের খালে (বর্তমান জেলখাল) একজন মাঝি কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় একা পড়ে রয়েছে। মাঝিটি মুসলমান। তার কাছে ঔষধপত্র তো দূরের কথা একফোঁটা পানি দেবারও লোক ছিলো না। দেখে অশ্বিনী বাবু নিজ হাতে লোকটির ভেদ বমি পরিস্কার করে তার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করলেন। এমন গুরুর শিষ্যের লেখায় মেথরের ছেলের চিকিৎসার বিষয়টি উত্থাপিত হওয়া বিস্ময়কর কিছু নয়।

এর প্রেক্ষিতে বলা যায়, চারণ কবি মুকুন্দদাসের *সমাজ* যাত্রাপালাটির আবেদন আজো বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজ করছে। তাই এটিকে একটি কালজয়ী যাত্রাপালা বললে অত্যুক্তি হয় না।

তথ্যসূত্র

১। বদিউর রহমান : বাংলার চারণ মুকুন্দদাস, প্যাপিরাস, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১০।

২। মুকুন্দ দাসের যত লেখা: প্যাপিরাস, ঢাকা ১ম প্রকাশ ডিসেম্বর-২০০৮। সম্পাদনা, বদিউর রহমান।

৩। গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস: চারণসম্রাট মুকুন্দদাস, প্রান্তল প্রকাশ, ৯ কার্তিক ১৪০৭ বঙ্গাব্দ (২৬ অক্টোবর ২০০০)

৪। আলমগীর মালেক: মুকুন্দ দাসের গানের স্বরলিপি; প্রকাশক: গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস, প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর-২০০৪।

৫। জয়গুরু গোস্বামী: চারণ কবি মুকুন্দদাস, বিশ্ববানী প্রকাশনী. কলকাতা, ২য় সংস্করণ - ১৯৯৮।

৬। নিখিল সেন: 'প্রাঙ্গণে মোর' আয়োজিত সেমিনারে পঠিত: ১৫সেপ্টেম্বর ২০০৬, মহিলা সমিতি মিলনায়তন, ঢাকা। (দ্র. "চারণ কবি মুকুন্দদাস প্রসঙ্গ"ঃ সংকলন ও সম্পাদনা, বদিউর রহমান, প্যাপিরাস, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি-২০১০। পৃঃ-১০৭-১২৩)।

৭। তপন বাগচী: ভারত বিচিত্রা: ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৪ / বাংলাদেশের যাত্রাগান জনমাধ্যম সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৫৬-১৬৬)।

৮। মিজান রহমান: কর্ষণ, লিটল ম্যাগাজিন, সম্পাদক মিজন রহমান ষষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা, স্বরূপকাঠী। (দ্রঃ "চারণ কবি মুকুন্দদাস প্রসঙ্গ"ঃ সংকলন ও সম্পাদনা, বদিউর রহমান, প্যাপিরাস, ঢাকা, জানুয়ারি-২১২-২২৭)।

৯। মিহির দত্ত: ভারত বিচিত্রা, ঢাকা ১৪শ বর্ষ ফাল্গুন -চৈত্র যুগ্ম সংখ্যা ১৩৯৪, ফেব্রুয়ারী এপ্রিল ১৯৮৭ (দ্রঃ "চারণ কবি মুকুন্দদাস প্রসঙ্গ"ঃ সংকলন ও সম্পাদনা, বদিউর রহমান, প্যাপিরাস, ঢাকা, জানুয়ারি-২২৮-২৩৬)।

১০। সরোয়ার আলম সৈকত: প্রথম আলো- ঢাকা ১৫ মে ২০০৭ (প্রবন্ধের নাম??) (দ্রঃ "চারণ কবি মুকুন্দদাস প্রসঙ্গ": সংকলন ও সম্পাদনা, বদিউর রহমান, প্যাপিরাস, ঢাকা, জানুয়ারি-২৬৮-২৭১)।

১১। হীরালাল দাশগুপ্ত: *স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ -১৯৯৭

কুসুমিত ইস্পাত এর কুসুম ও ইস্পাত

মুহম্মদ মুহসিন

[হুমায়ূন কবির (২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৮ - ৬ জুন ১৯৭২) বিশ শতকের বাংলা ভাষার একজন প্রগতিশীল কবি। তিনি বামপন্থী রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ছিলেন এবং ১৯৭২ সালে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্বে নিহত হন।

ব্রজমোহন কলেজ থেকে ১৯৬৩ সালে ম্যাট্রিক, ১৯৬৫ সালে একই কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। ১৯৬৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় অনার্স এবং ১৯৬৯ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ পাস করেন। ১৯৭০-এ বাংলা একাডেমি গবেষণা বৃত্তিলাভ করেন। বাংলা একাডেমিতে তার গবেষণার বিষয় ছিলো সাম্প্রতিক জীবন চৈতন্য ও জীবনানন্দ দাশের কবিতা।

১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। পত্রপত্রিকায় তার অসংখ্য প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে। ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে গোপন বিপ্লবী রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেন এবং বামপ্রগতিশীল সংগঠনের সাথে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। একই বছর গোপন রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য সরকারের রোষানলে পড়েন এবং গ্রেফতার বরণ করেন। পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালে লেখক সংগ্রাম শিবির প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭২ সালে লেখক সংগ্রাম শিবিরের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ লেখক শিবির নাম রাখা হয়। পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির প্রধান নেতা সিরাজ সিকদারের সঙ্গে পার্টি কর্মসূচির প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে তার বিরোধ দেখা দেয়।

১৯৭২ সালের ৬ জুন তিনি আততায়ীর গুলিতে ঢাকায় নিহত হন। তাকে তৎকালীন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সেলিম শাহনেওয়াজ ফজলু ও সুলতান চক্রের সক্রিয়, ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করে। ৬ জুন রাত ৯টায় ঢাকার ইন্দিরা রোডের বাড়ি থেকে তাকে ডেকে এনে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই খতমে অংশগ্রহণকারী গেরিলাদের পরবর্তীকালে অভিনন্দন জানিয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি। হুমায়ূন কবিরের বোনকে বিয়ে করেছিলেন সেলিম শাহনেওয়াজ ফজলু। এই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াও হুমায়ূন কবিরের ব্যাপারে পার্টিতে অভিযোগ ওঠে তার ভাই ফিরোজ কবিরের বহিষ্কারকে মেনে না নেয়া। ফিরোজ কবিরকে ইতোঃপূর্বে একজন 'কমরেড' হত্যার অভিযোগে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। হুমায়ূন কবির হত্যার কারণ হিসেবে পার্টির বক্তব্যে বলা হয়, 'সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পুরোপুরি বুর্জোয়া দৃষ্টিকোণ সম্পন্ন হওয়ায় স্বভাবতই হুমায়ূন কবিরের মধ্যে ব্যক্তি স্বার্থের প্রাধান্য ছিলো'। হুমায়ূন কবিরের হত্যাকে পরবর্তীতে পার্টি 'খতম করাটা ভুল হয়েছে' বলে মূল্যায়ন করে।–সম্পাদক]

নিকোলাই অস্ত্রভস্কির দুনিয়া কাঁপানো উপন্যাস *How the Steel Was Tempered* বাংলাভাষায় অনুবাদ হয়েছিলো *ইস্পাত* নামে। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলনের সাথে জড়িত উদ্দীপ্ত তরুণ হুমায়ূন কবির স্বাভাবিকভাবেই এই নামটি ভালোবেসে ফেলেছিলেন। বয়সের দাবিতে সেই ভালোবাসার দুটো দিক ছিলো বলে ভাবা যায়। সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি তার অঙ্গীকার থেকে জেনেছিলো ক্লিষ্ট সমাজ ও জীবন বাস্তবতার প্রতি দায়বোধের ইস্পাত-কঠোর অনুভব। আর তারুণ্যের চিরন্তন দাবি থেকে জেগেছিলো কুসুমিত সৌরভ ও সৌন্দর্যের সমার্থক প্রেমের অনুভব। এই দুই অনুভবের শিহরণ-সমবায় থেকে জন্ম নিয়েছে যে কবিতামালা অনেকটা তারই কাব্যরূপ *কুসুমিত ইস্পাত*।

কুসুমিত ইস্পাত নামটি কবির নিজের দেয়া। তবে এই গ্রন্থসহ কোনো গ্রন্থই কবি হুমায়ূন কবির জীবদ্দশায় প্রকাশ করে যেতে পারেননি। ১৯৭২ সালে ৭৪টি কবিতা দিয়ে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তিনি সাজিয়েছিলেন। গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলো বাংলাবাজারের প্রকাশনী 'খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি'। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে দেয়া প্রথম প্রুফটি হুমায়ূন কবির দেখে যেতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয় প্রুফ পাওয়ার আগেই ১৯৭২ সালের ৬ জুন হুমায়ূন কবির আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। তার মৃত্যুর মাস খানেকেরে মধ্যে *কুসুমিত ইস্পাত*-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ততক্ষণে হুমায়ূন কবিরকে বাংলার ক্লেদাক্ত সমাজ নৃশংসতার শানানো ইস্পাতে বিদ্ধ করে পরপারে পাঠিয়ে দিলেও, বাংলার কাব্যজগৎ মর্মান্তিক হারানোর বেদনা নিয়ে অনুভব করতে শুরু করেছে তার কাব্যকুসুমের সৌরভ।

আমাদের মাঝে হুমায়ূন কবির এমন চেতনার দ্বৈরথে এখনো বর্তমান। হুমায়ূন কবির নামটি একই সাথে আমাদের শানানো ইস্পাতের নিষ্ঠুরতাকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং কবিতা জগতের একটা কুসুম সৌরভকে অনুভবে এনে দেয়। তার কাব্যগ্রন্থ *কুসুমিত ইস্পাত*ও অনেকটা একই ধারায় আমাদের অনুভবে এনে দেয় সমাজবাস্তবতার প্রতি একজন সমাজতান্ত্রিক কর্মীর অনুভবের কঠোরতা এবং একজন তরুণের চিরন্তন অনুভবের প্রেমসৌরভ।

কুসুমিত ইস্পাত-এর বেশিরভাগ কবিতা উপরের দাবির যথার্থতা প্রতিপাদন করে বলে আমার বিশ্বাস। শুরুর কবিতাটিই ধরা যাক। কবিতার নাম 'বাগান'। বাগান হলো কুসুমের ঠিকানা। কিন্তু সেই ঠিকানায়ও তরুণ কবি শুধু কুসুম দেখছেন না, শুধু তরুণ-সুলভ অনুভবের প্রেম সৌরভ অনুভব করছেন না। সেই কুসুমবাগেও তাকে স্মরণ রাখতে হচ্ছে 'পাপের শাপ', 'হিমের ছোঁয়া' এবং 'সাপের ফনা'র বাস্তবতা। অনেক সুখের অনুভবের মাঝেও তার চোখে ভাসছে– 'ঝাউয়ের ডালে নরম কোমল সাপ'। এই সাপের আশ্রয় হিসেবে সমাজকে দেখা যেকোনো শ্রেণিসচেতন সমাজতান্ত্রিক কর্মীর জন্য একটি পরিচিত দৃশ্য।

'বৃক্ষ' কবিতায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মী কবি তার নন্দন রচনা করেন সশস্ত্র দ্রোহের ভাষায়। 'সুঠাম বৃক্ষের' বনকে কবি এখানে কাব্যিকীকরণ করেছেন। সেখানে রয়েছে 'মাতাল খুরের কোলাহল', সেখানে 'ভাড়াটে কসাই/ কাঠুরে ও হত্যাকারী

লাফায় দাপায়', সেখানে 'সফল যুবারা/ স্বহস্তে বানিয়ে তোলে তাপিত কুঠার', সেখানে রক্তধারা 'পৃথিবীর ধূলোকে ভেজায়'। বৃক্ষ ও বনের কাব্যজমিনে এভাবে বিপ্লবী কবির অস্ত্রাঘাত ও রুধিরের নন্দন রচিত হয়েছে। প্রেমের সুখদায়ী শক্তি কিংবা কাব্যের মেহিনী শক্তি কবিকে বাস্তবতায় যেনো একটি ঠিকানা দেয় না বলেই বিপ্লবী কবিকে উচ্চারণ করতে হয়– 'তবু যে দাহন/ বুকে থেকে যায়, নিসর্গের স্মৃতিরেখা/ পল্লবের মোহিনী আড়াল/ ধীরস্থির বেলাভূমি মানুষের নীল আকাশ।' এই সর্বনাশের দিকে তাকিয়ে কবিতার সৃষ্টি ও সমৃদ্ধিকে দূরে ঠেলে দিয়ে কবিকে বলতে হচ্ছে– 'আমার সকল দর্প আনত আভূমি/ যেন রিক্ত হয়ে গেছি, যেন কোন কবিতা লিখিনি' [শোক]। রাজনীতির ক্রুরতা ও ক্রুদ্ধতার বিপরীতেও কবিকে তার সুকুমার কাব্যবৃত্তি ভুলে যেতে হয়। তাকে বলতে হয়– 'বাগানে জোনাক এলে বাতাস যে সোনালী সারঙ/ বাজায়; ফুলের বুকে কাঁপে মৃদু নীল থরো থরো।/ এসব জীবনে পুষে সাবলীল বাসাতে কাটাবো/ যখন ভেবেছি আমি ঠিক সেই শান্ত শাদা ভোরে/ মেশিনগানের শব্দ ভেঙেছে ফসলী নীরবতা।' সোনালি সারঙ বাজানো বাতাসে ভেসে বেড়ানোর কল্পনা এই রাজনৈতিক বাস্তবতায় মেশিনগানের গোলায় বিধ্বস্ত হয়।

তারপর এই কল্পনা রঙিন জীবন কেমন হয়ে দাঁড়ায়। এক খেলা হয়ে দাঁড়ায়। কবি 'দুঃখ দিনের গাঁথা' কবিতায় সেই খেলা নিয়ে বলেছেন– 'জীবন মৃত্যুর এই খেলা। কারা জেতে?/ যারা হাঁটে রাত্রিতে ..../ যাদের বিনিদ্র রক্ত, প্ল্যাটফর্মে মাল্লাদের ঘামে/ সোনার টুকরো ছেলে টর্চার চেম্বারে/ যাদের বুকের রক্ত ফোটা ফোটা ঝরে।' কবির কল্পনাকুসুম ইস্পাতকঠিন জীবনকে আসলে কুসুমিত করে তোলার শক্তি আর রাখে না। তাই কবির চূড়ান্ত জয়গান কুসুমের নয় বরং রুধিরের কিংবা কোনো এক অবিজিত ইস্পাত কাঠিন্যের। তাই চূড়ান্ত উচ্চারণে কবিকে বলতে শোনা যায়– 'রোদনের ধ্বনি মুছে জয়ধ্বনি উঠুক তখন/ করতলগত অগ্নি অরণ্যে ছোঁয়াও।'

আততায়ীর গুলিতে ঝরা কবির রক্তও হয়তো বিপ্লবের এই ধ্বনিটি উচ্চারণ করেছে। এমনকি অনেক সাহসে এই বিপ্লবের কবি রূপসী বাংলার রোমান্টিক কবি জীবনানন্দ দাশকে পর্যন্ত এমন কঠিন বাস্তবতাদর্শী এক কবি হিসেবে কল্পনা করতে চান। সাহসের সাথেই জীবনানন্দকে তিনি প্রশ্ন করেন–

নিসর্গ তোমাকে কবি দিয়েছিল কেমন লবণ
যাদের রূপ বা স্বাদে ভীষণ শহর তার মাধবী নিধন
ক্রুদ্ধ কথকতা নিয়ে হয়ে যেত হলুদ সংসার
না হলে কেমন করে তুমি ছিলে
জ্বরামৃত্যুমারী ভরা আমাদের নিরব নিখিলে।

জাতীয় মঙ্গল : এক অগ্রযাত্রার কাব্য

মোহাম্মদ সাকিবুল হাসান

[এক সময়ের বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের চিফ হুইপ কবি মোজাম্মেল হক বিশেষ করে *জাতীয় মঙ্গল*-এর কবি হিসেবে খ্যাত। তার পিতার নাম মুন্সী আবদুল করিম। জন্ম: ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ সাল। মৃত্যু: ১ আগস্ট ১৯৭৬ সাল। গ্রাম: বাপ্তা, থানা: ভোলা সদর, জেলা: ভোলা।

তিনি ১৯০১ সালে কলকাতা মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আইএ পাস করেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। ১৯১৫ সালে তিনি গ্র্যাজুয়েশন অর্জন করেন। তিনি ভোলা জেলার তৃতীয় গ্র্যাজুয়েট। ছাত্রজীবনে তিনি ভোলা মহকুমা শহরের বার লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখতে পান, ৬৩ জন আইনজীবীর মধ্যে একজন মাত্র মুসলমান। মুসলমানের এই পশ্চাৎপদতা দেখে সে সময়ই সমাজ জীবনে মুসলমানদের উন্নয়নে একটি বিপ্লব সৃষ্টির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পাদিত *সাপ্তাহিক ছোলতান* এবং মুন্সী রেয়াজউদ্দিন সম্পাদিত *মাসিক ইসলাম প্রচারক* ও সাপ্তাহিক *মোহাম্মদী* পত্রিকায় তিনি কবিতা লিখেছেন। ১৯০৯ সালে তার প্রথম কাব্য *জাতীয় মঙ্গল* প্রকাশিত হয়। মুসলমানদের কর্মে অনুপ্রাণিত করাই ছিলো তার কবিতার লক্ষ্য। সমাজে জাগরণ আনয়নের জন্য কবিতার ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত হয়েছে জাগরণী গান।

কলকাতার পত্রপত্রিকা এবং বিশিষ্ট মুসলিম ও হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা *জাতীয় মঙ্গল* কাব্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *সমাজ মঙ্গল* (৫০টি কবিতার সঙ্কলন), *উত্থাপন সঙ্গীত*, *কুরআনের বঙ্গানুবাদ* (১০ পারা) প্রভৃতি।

নিজ কাব্য রচনায় ব্যস্ত না থেকে তিনি আরো কবি-সাহিত্যিকদের তৈরীতে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় মনোযোগ দেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' আদলে তিনি গড়ে তোলেন 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' এবং ১৯২১ সাল থেকে প্রকাশ করতে থাকেন সমিতির ত্রৈমাসিক মুখপত্র *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি পত্রিকা*। প্রথমদিকে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এর সম্পাদনা করলেও তার অবর্তমানে মোজাম্মেল হক একটানা পাঁচ বছর এ সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এ সময়েই করাচী থেকে কবি নজরুল প্রেরিত 'ক্ষমা' নামে কবিতাটি এ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ পায়। ১৯২৬ সালে বাঙালি পল্টন ভেঙে দিলে কবি নজরুল এই সমিতি এবং পত্রিকা অফিসেই এসে ওঠেন। এ পত্রিকার মাধ্যমেই আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অবকাঠামো নির্মাণের প্রধান লেখকগণ জেগে ওঠেন।

১৯২১ সালে কবি মোজাম্মেল হক প্রতিষ্ঠা করেন *দি ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স* নামের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। কাজী নজরুল ইসলামসহ বিশিষ্ট লেখকদের ৩২টি মূল্যবান বই এই প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি প্রকাশ করেন।

তার স্ত্রীর নাম হালিমা থাতুন। তার পুত্র এম মোকাম্মেল হক ভূমি সচিব এবং পরবর্তীতে বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান ছিলেন। ভোলা জেলা সদরে একমাত্র টাউন হলটি কবি মোজম্মেল হক টাউন হল নামে প্রতিষ্ঠিত। ১ আগষ্ট ১৯৭৬ তারিখে এই কবি ও সমাজসেবক মৃত্যু বরণ করেন।–সম্পাদক]

সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ একজন কবি হিসেবে পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজের জাগরণে মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের (১৮৮৩ - ১৯৭৬) অবদান স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। যে সময়, সমাজ ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় বাংলা সাহিত্যে তার আবির্ভাব; সেই বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই আমরা তার *জাতীয় মঙ্গল* (১৯০৯) কাব্যগ্রন্থের আলোচনায় সচেষ্ট হবো। মূলত তিনি কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য কাব্যচর্চায় ব্রতী হননি, বরং সমকালীন মুসলমান সমাজের পশ্চাদপদতায় ক্লিষ্ট হয়েই সাহিত্যচর্চায় নিমগ্ন হন। এ প্রসঙ্গে *বরিশালপিডিয়ায়* প্রকাশিত একটি অংশ উদ্ধৃত করছি :

> ছাত্রজীবনে তিনি ভোলা মহকুমা শহরের বার লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখতে পান, ৬৩ জন আইনজীবীর মধ্যে একজন মুসলমান। মুসলমানের এই পশ্চাদপদতা দেখে সে সময়ই তিনি সমাজ জীবনে মুসলমানদের উন্নয়নে একটি বিপ্লব সৃষ্টির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

অধঃপতিত মুসলমান সমাজের এই দুরবস্থা ছাত্রাবস্থায়ই তাকে উৎকণ্ঠিত, উদ্বেলিত এবং বেদনা-ভারাক্রান্ত করে তোলে। ফলে পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে একটি সুখী সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিলো তার জীবনের ব্রত।

কবি, সংগঠক, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ *জাতীয় মঙ্গল*-এ সমকালীন মুসলমান সমাজের পশ্চাদ্‌পদতার স্বরূপ যেমন উন্মোচন করেছেন, তেমনি এ থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য পথও নির্দেশ করেছেন। মূলত এ-কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে কবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দরিদ্র, অশিক্ষিত, অন্ধ শাস্ত্রানুগত, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অনীহা পোষণকারী এবং বিশ্বাসের বেড়াজালে বন্দি মুসলমানদের মধ্যে সঞ্চার করতে চেয়েছেন এক নবতর উদ্দীপনা, যে উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে-পড়া মুসলমান জাতি খুঁজে পাবে তার নব উজ্জীবনের মূলমন্ত্র। এ সম্পর্কে *জাতীয় মঙ্গল* কাব্যগ্রন্থের 'নিবেদন' অংশে প্রদত্ত কবির বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> তৎকালীন মুসলমানদের শিক্ষাহীন ও কুসংস্কারে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় দেখিয়া আমার কিশোর-প্রাণ গভীর দুঃখে ও মর্মবেদনায় আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল। ... অধঃপতিত মুসলমান সমাজকে ইংরেজি শিক্ষিত করিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আনিয়োগ করিব এবং প্রাণপণ চেষ্টা করিব।
>
> ['নিবেদন', *জাতীয় মঙ্গল*, বাংলা একাডেমি, কার্তিক ১৩৮০]

জাতীয় মঙ্গল কাব্যগ্রন্থের তেরোটি কবিতা জুড়ে কবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক শ্রদ্ধাবনতচিত্তে মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্যের কথা যেমন স্মরণ করেছেন, তেমনি বর্তমান সংকট মোকাবেলায় তিনি অতীতের কর্মময় জীবন-ধারাকে অনুসরণ করার কথাও বলেছেন। কবিতার নামগুলো থেকেই আমরা কবির অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। 'মঙ্গল-গীতি', 'কি ফল লভিবে ঘুমি?' 'চল্‌রে তোরা এখনি', 'মঙ্গল আহবান', 'নির্জীব বাঙ্গালী', 'আজরে তোরা চল', 'আয় রে তোরা আয়', 'জাতীয় সঙ্গীত', 'আর কবে তুমি উঠবে ভাই?' 'আজকে তোদের চাই', 'বারেক আজি চলরে', 'দাও বলে হাত পেতো না' এবং 'এসগো আজিকে তবে'।

জাতীয় মঙ্গল কাব্যগ্রন্থে কবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক পিছিয়ে পড়া ঘুমন্ত বাঙালি মুসলমানদের অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে আলোর ভুবনে আমন্ত্রণ জানান, যে আলোর প্রভায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতিও জেগে উঠেছে নব উদ্যমে। যে জাতি কর্মকেই জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছে, সে জাতিই উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছেন। তাই কবির উচ্চারণ-

দুর্বল যা'দের নামের ভূষণ
বলিয়া জানিত নিখিল ভুবন,
দেখ চেয়ে দেখ, এ শুভ-লগন
তারাও ছাড়েনি হায়!
[মঙ্গল গীতি]

জাতি হিসেবে মুসলমানদের এক সময় বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছিলো। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় তাদের অবদান ছিলো স্বকীয়তামণ্ডিত। সাহিত্য, দর্শন, নীতিবিদ্যা, ললিতকলা, জ্যোতিষশাস্ত্র, ভূগোল, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের পদচারণা ছিলো প্রসংশনীয়। শুধু তাই নয়, ব্যবসাবাণিজ্যেও মুসলমানরা পিছিয়ে ছিলো না। অথচ আজ মুসলমানদের দুর্দশার অন্ত নেই। তাই অতীতের মুসলমানদের গৌরব দীপ্ত সময়ের সাথে বর্তমান মুসলমানদের দুরাবস্থার সাদৃশ্য কল্পনা করে তিনি লিখেছেন-

তোরা না ছিলি কভু চিরহীন
তোদের গরবে ধরা একদিন
গৌরব- দীপ্ত ছিল;- এত দীন
হইলি কেমনে ভাই?
[মঙ্গল-গীতি]

কবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজের মধ্যে নব আশার সঞ্চার করতে চান কর্মময় জীবন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। কর্মবিমুখ জাতি কখনোই উন্নতি করতে পারে না। তাই জাতি হিসেবে উন্নতি বিধানের জন্য দরকার কর্মচাঞ্চল্যময় জীবন। এ-জন্যই কর্মমুখর জীবনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে কবির উচ্চারণ-

নিদ্রা যে আর নাহিক সাজে
রহিস নে আর মিথ্যা কাজে
নবোৎসাহ নবীন আশায়
নাচুক তোদের ধমনী!
চলরে তোরা এখনই।
[চলরে তোরা এখনই]

যেকোনো জাতির অগ্রগতির জন্য নারী-পুরুষের সম-অংশীদারিত্বের বিকল্প নেই। আর এই সম-অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। মা শিক্ষিত হলে সন্তান শিক্ষিত, মার্জিত হবে। কিন্তু মুসলমান সমাজে নারীশিক্ষা সম্পর্কে নানাবিধ কুসংস্কার ও পশ্চাৎপদ ধারণা বিদ্যমান। তাই মুসলমান সমাজে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কবি যথার্থই লিখেছেন-

শিশু- হৃদে মাতা উপদেশ - ছলে,
যে আকাঙ্ক্ষা বীজ বপে কুতূহলে,
তাহার সুফল ফলে চির দিন-
এ নহে স্বপন-কাহিনী!
চলরে তোরা এখনি।
[চলরে তোরা এখনি]

আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকা মুসলমান সমাজের অগ্রগতির জন্য কবি শিক্ষাকেই মূল হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করেছেন। কারণ একমাত্র শিক্ষাই পারে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে একটি জাতিকে মুক্ত করে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে। শিক্ষার মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অজানা রহস্য সম্পর্কে অবগত হয় এবং নিজের অন্তর্শক্তিতে বলীয়ান হয়ে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে। মানুষের সামাজিক ও আত্মিক উন্নতি সাধনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। তাই উদাত্ত কণ্ঠে কবির আহ্বান-

জাতীয় শিক্ষার করি 'সমিতি স্থাপন
প্রতি বর্ষে প্রত্যেক নগরে,
নিজেদের সন্তানের সুশিক্ষার ভার
তুলে লও আপনার করে,
যে ভাবে শিক্ষাদান করিলে তাদের
হইবেক অভীষ্ট সাধন,
সেইশিক্ষা দান হেতু হও চেষ্টান্বিত,-
উপায় করহ উদ্ভাবন।
[মঙ্গল আহবান]

মানব জাতির জন্য মঙ্গলজনক সবকিছুকেই নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন কবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। কারণ মানুষের জন্য যা কিছু মঙ্গলজনক, তা কোনো দেশের নিজস্ব সম্পদ নয়। তা সারা বিশ্বের সম্পদ। আর যে জাতি যতো উদারচিত্তে বাইরের জ্ঞানকে নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার করতে পারে, সে জাতি ততো উন্নত ও মনুষ্যত্বের অধিকারী। তাই 'মঙ্গল-আহবান' কবিতায় তিনি বলেছেন-

সমস্ত জগৎ হতে সৎ শিক্ষাণীয়-
প্রীতিপ্রাণে কর আহবান।
[মঙ্গল-আহবান]

জাতীয় মঙ্গল কাব্যে কবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সমাজের প্রতি দায়িত্বজ্ঞানহীন মোল্লা-মৌলভীদের কটাক্ষ করেছেন; যারা শ্রমবিমুখ কাজের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে সমাজের অমঙ্গলই করে যাচ্ছে। এই সব পরজীবী মোল্লা-মৌলভীদের উদ্দেশ্যে কবির দৃপ্ত উচ্চারণ-

পরহিতে প্রাণ দিয়া,
কেহ মরে চেঁচাইয়া,
কেহ ধর্ম-বক্তা হ'য়ে বক্তৃতা ফাটায়।
নির্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখবি আয়।
[নির্জীব বাঙ্গালী]

কবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক অন্য কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেননি, বরং পাশাপাশি বসবাস করেও হিন্দু সম্প্রদায় পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে কীভাবে উন্নতি সাধন করছে, সেই দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে ঘুমন্ত, অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায়কে তিনি জাগাতে চান। তাদের মধ্যে তিনি সঞ্চার করতে চান নব উজ্জীবনের মন্ত্র।

তব প্রতিবেশী হিন্দু ভ্রাতাগণ
তাদেরও পরাণে আশার কিরণ
ঝলকে ঝলকে পড়িছে এখন
যথা তথা আজিকে দেখিতে পাই!
জাগিতে কি তব বাসনা নাই?
[আর কবে তুমি উঠিবে ভাই]

কর্মহীন জীবনে উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই কবি কর্মমুখর জীবনের জয়গানই গেয়েছেন তার *জাতীয় মঙ্গল* কাব্যগ্রন্থে। আলস্য আর জড়তাকে যে জাতি জীবনাদর্শরূপে গ্রহণ করে, সে জাতি কখনো উন্নতি বিধান করতে পারে না। তাই আলস্য ত্যাগ করে কর্মমুখর জীবনের প্রতি আহবান জানিয়ে কবি লিখেছেন-

বহুকাল ত কুঁড়ের মত,
হয়ে আছিস শয্যাগত,
একটু শুধু কুঁড়েমি তোর
বারেক আজি ভোল্‌রে!
[বারেক আজি চলরে]

কবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করতে চেয়েছেন। নিদ্রামগ্ন মুসলমান সম্প্রদায়ের নিদ্রাভঙ্গ করতে চেয়েছেন কবিতার মধ্য দিয়ে। তাই *জাতীয় মঙ্গল* কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতায় কবির দৃপ্ত উচ্চারণ-

খোলগো নয়ন দেখগো দেখগো,
সকলি উঠিয়া ধায়,
তুমি কি একলা নিদ্রা-মগন
এখনো রহিবে হায়!
ওগো, এখনও রহিবে হায়।
[এসগো আজিকে তবে]

কবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সামনের দিক এগিয়ে চলা পৃথিবীর অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়কেও দেখতে চান উন্নতির চরম শিখরে। তিনি নিদ্রামগ্ন বাঙালি মুসলমান সমাজকে জাগাতে চেয়েছেন কবিতার সুরে। নিদ্রামগ্নের নিদ্রা ভাঙানোর এই সুর সরল ছন্দে *জাতীয় মঙ্গল* কাব্যগ্রন্থের প্রতি ছত্রে ছড়িয়ে রয়েছে। অশিক্ষা, কুসংস্কার আর বিশ্বাসের বেড়াজালে বন্দি বাঙালি মুসলমান সমাজের জাগরণে মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের *জাতীয় মঙ্গল* কাব্যগ্রন্থ পালন করেছিল অগ্রণী ভূমিকা।

বিষমক্রান্তি : প্রান্তিক মানুষের জীবনকথা

মাহমুদ মিটুল

[মোহাম্মদ কাসেম একজন বিস্মৃত গুণী লেখক। ১৯১৬ সালে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া ইউনিয়নের নয়াখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বিভিন্ন বিখ্যাত পত্রিকায় লিখেছেন ও সাংবাদিকতা করেছেন। মোহাম্মদ কাসেম ভোলা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে উলা পাশ করেন এবং পাতারহাট মুসলিম হাইস্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ করেন। ব্রিটিশ শাসনামলে তিনি কলকাতা গমন করেন এবং সেখানে পার্ক-সার্কাস হাইস্কুলে হেড মৌলভী হিসেবে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। ১৯৪৩ সালে কলকাতায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত *দৈনিক ইত্তেহাদ* পত্রিকায় যোগদান করেন। সেখানে তিনি ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত সাংবাদিকতা করেন। এরপর তিনি দেশবিভাগ সংক্রান্ত কারণে ঢাকায় চলে আসেন এবং ১৯৪৯ সালে *নতুন দিন* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন। ১৯৫৮ সালে তৎকালীন সামরিক সরকার কাগজটি বন্ধ করে দেয়। তখন তিনি তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় যোগদান করেন। স্বাধীনতার পর শেখ ফজলুল হক মণি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত *দৈনিক বাংলার বাণী* কাগজে প্রশাসনিক বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে তিনি ওই চাকুরি ছেড়ে দেন। এরপর তিনি বাংলা একাডেমি ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ এবং মৌলিক লেখার কাজে মনোনিবেশ করেন।

মোহাম্মদ কাসেমের প্রথম উপন্যাস *শতাব্দীর অভিশাপ* প্রকাশিত হয় ব্রিটিশ আমলে। এজন্য ১৯৫২ সালে পূর্ব-পাকিস্তান সরকার তাকে পুরস্কৃত করে। তিনি বিখ্যাত আরবি লেখক ইবনে খালদুনের গ্রন্থ *আলমুকাদ্দিমা* বাংলায় অনুবাদ করেন। এছাড়াও তার অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: *শতাব্দীর অভিশাপ*, *ফিনিসিয়া থেকে ফিলিপাইন*, *বিষমক্রান্তি*, *রূপকথার সোনার গাঁ*, *ইতিহাসের অজানা গল্প*, *বাংলাদেশ: জাতি ও সংস্কৃতি*, *সবুজ বনে দাবানল* ইত্যাদি।

তার স্ত্রী আনোয়ারা বেগম ২০০১ সালে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল আনামও ইতোমধ্যে পরলোক গমন করেছেন। তার মেজছেলে ইঞ্জিনিয়ার শফিকুল আনাম অবসর জীবন যাপন করছেন। তিনি বাংলাদেশ লায়ন্সের প্রাক্তন গভর্নর ও ঢাকাস্থ মেহেন্দিগঞ্জ সমিতির প্রাক্তন সভাপতি। তার কনিষ্ঠ পুত্র ড. মাহাবুব আলম কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। মোহাম্মদ কাসেমের ৫ মেয়েই উচ্চশিক্ষিত। বড় মেয়ে শিরিন জাহান গৃহিণী, মেজমেয়ে বিলকিস খান অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক-কর্মকর্তা, ৩য় মেয়ে লায়লা ইয়াফির বস্ত্রদপ্তরে উপপরিচালক পদে আছেন, ৪র্থ মেয়ে লায়লা ইয়াসমিন একজন সিনিয়র শিক্ষক এবং ৫ম মেয়ে জেসমিন কাসেম একজন গৃহিণী। মোহাম্মদ কাসেম ১৯৯৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ৮১ বছর বয়সে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তাকে মেহেন্দিগঞ্জের নয়াখালী গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও পাঁচ মেয়ে রেখে গেছেন।– সম্পাদক]

বিষমক্রান্তি গ্রন্থটি মোহাম্মদ কাসেম রচিত একটি গল্পগ্রন্থ। এই লেখক নাম ও গ্রন্থনাম দুইই বর্তমান পাঠকের কাছে অপরিচিত লাগতে পারে। যদিও খুব বেশিদিন আগে নয়, *বিষমক্রান্তি* প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৬ সালের জুলাই মাসে। এরপর মাত্র তিন দশক পেরিয়েছে। কিন্তু এই তিন দশকেই আমরা ভুলে গেছি পুস্তক নাম, এমন কি লেখক নামও। আমরা জাতি হিসেবে বিস্মৃতিপ্রবণ, কথাটা বহুবার শুনেছি। কিন্তু অনুধাবন করতে পারিনি। তবে মোহাম্মদ কাসেমের কিছু গ্রন্থ যখন হাতে পাই এবং তার এক মেয়ের সাথে কথা হয়, তখন বিষয়টি আমার অনুধাবনে আসে। মোহাম্মদ কাসেম প্রয়াত হয়েছেন ১৯৯৭ সালে। এরপর থেকে যে ক্রান্তি শুরু হয়েছে, অর্থাৎ 'মিলেনিয়াম গোল' নামে আমাদের জাতিস্বত্তা ও সংস্কৃতিকে যেভাবে বহুজাতিকতার মোড়কে ঢোকানো হয়েছে তাতে করে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্বাভাবিক বিষয়টি মেনে নেওয়া সহজ নয়; অন্তত যার মধ্যে নূন্যতম জাতিবোধ আছে। কারণ, এর ফল হিসেবে আমরা এরকম অসংখ্য প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিকে আড়াল করে নানাবিধ বাম্পার ফলনের দিকে ঝুঁকে আছি; বিদেশি সংস্কৃতি গ্রাস করেছে আজ পুরো ভূখণ্ড। যাহোক, আমার এ লেখার উদ্দেশ্য এসব জাতিগত বিকৃতির স্বরূপ উন্মোচন নয়। বরং এই বিস্মৃত লেখকের গল্পগ্রন্থ *বিষমক্রান্তি*কে পাঠকের সামনে আনার জন্য আমি পাঠাভিজ্ঞতা তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

বিষমক্রান্তি গ্রন্থটি ১৯৮৬ সালে প্রথম প্রকাশ করে 'শতাব্দী প্রকাশনী'। এরপর আর কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে কিনা সে তথ্য আমাদের জানা নাই। প্রচ্ছদ করেছেন এম. এল. রায়। মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২০ টাকা। লেখক গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন কবি আবুল কালাম মুস্তফাকে। গ্রন্থটিতে ১৩টি গল্প সংযোজিত হয়েছে। মানবজীবনের ১৩টি ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়েছে এই ১৩টি গল্পে। প্রতিটি গল্পের প্রেক্ষাপট-চিত্রপট-জীবনবোধ ভিন্ন। প্রতিটি গল্পপাঠ এক একটা নতুন অভিজ্ঞতা দানের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ উপহার দেয়। মোহাম্মদ কাসেমের এ গল্পগুলোতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের আন্তঃযোগাযোগ ও হিন্দু-মুসলমানের পারস্পারিক সহাবস্থানের আখ্যান থেকে শুরু করে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কথা, ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি, ১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষ কবলিত শহর-গ্রামের চিত্র উঠে এসেছে। এছাড়াও সত্তর ও আশির দশকে ঢাকার নব্য পয়সাওয়ালা লোকদের মনোভাব ও জীবনচিত্র, গ্রামীণ মানুষের জীবনাচার, পাগলীর চরিত্রায়ন, বহুদিন পরে গ্রামে

ফেরা শহুরে ব্যক্তির নস্টালজিয়াসহ নানা বর্ণের চিত্র ও চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে মোহাম্মদ কাসেম আমাদের জন্য রেখে গেছেন এক চমৎকার গল্পগ্রন্থ *বিষমক্রান্তি*।

আলোচ্য গ্রন্থের সবগুলো গল্পই নামের সাথে সঙ্গতি বিধান করে রাখা হয়েছে। ১৩টি গল্পই কোনো না কোনো ক্রান্তিকালীন বিষয় নিয়ে রচিত। গল্পকার নিজেই ভূমিকায় বলেছেন, 'এ-গ্রন্থে স্বনির্বাচিত তেরোটি ছোটোগল্প সন্নিবেশিত হলো। এগুলো বিভিন্ন সময়ে লেখা। এর সব ক'টি গল্পই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। একক গ্রন্থাকারে সংকলিত, এর নাম দেয়া হলো 'বিষমক্রান্তি'। সমাজের ক্রান্তিলগ্নের সাথে গল্পগুলোর কিছুটা সঙ্গতি আছে মনে করে নামটা দেয়া।' প্রথম গল্পটি রচিত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের উপর ভিত্তি করে। এরপর '৫২, '৭১ বা '৭৪-এর মতো ভয়াবহ সময় উঠে এসেছে। কিংবা মুচির কাহিনিতে উঠে এসেছে দেশিয় চামড়ার জুতার জায়গায় বিদেশি প্লাস্টিকের জুতার বাজার দখল। অথবা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে কামাল-লক্ষ্মীর প্রণয়ে জাতিগত বিদ্বেষ। কিন্তু একটু অবাক লাগছে এই ভেবে যে লেখক নিজে দেশভাগের শিকার হয়েও তার এই গ্রন্থের দেশবিভাগের যাতনা ও বঞ্চনার কোনো গল্প রাখেননি। হতে পারে এ নিয়ে তিনি তার অন্যকোনো গ্রন্থে বিশদ বয়ান করেছে, কিংবা কোনো উপন্যাস রচনা করেছেন। আগেই বলেছি, আমাদের হাতে তার রচিত মাত্র চারটি গ্রন্থ এসেছে। বাকি গ্রন্থগুলো খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনকি তার পরিবারের কারো কাছেও নেই।

গ্রন্থের শুরু হয়েছে 'বাঘমার খাঁ' নামের গল্প সংযোজনে। উক্ত গল্পে লেখক আমাদের নিয়ে যান বহু আগের দক্ষিণবাংলার এক জনপদে, যে অঞ্চল মগ-হার্মদ-পর্তুগীজ জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত ছিলো, আক্রান্ত ছিলো চিতাবাঘের মতো জানোয়ার দ্বারাও। তাদের লুটপাট ও নৃশংসতার পরও টিকে যাওয়া কিছু সংগ্রামী মানুষের কথা উঠে এসেছে এ গল্পে। এই দস্যুদের সাথে ক্রমাগত প্রতিরোধ গড়ে টিকে থাকা কিছু লাঠিয়ালের চরিত্রায়নে আমরা গ্রমীণ লাঠিখেলা ও পাহলওয়ান জীবনের কাহিনি পাই এই গল্পে। দ্বিতীয় গল্প 'পথের প্রতিবেশী' শুরু হয় বরিশাল থেকে খুলনাগামী স্টিমার থেকে। এরপর খুলনা থেকে কলকাতার শিয়ালদাহ রেল-স্টেশন হয়ে গল্প গড়ায় কলকাতার এক মেস বাসায়। গল্পে বক্তা একজন মুসলমান যিনি কলকাতায় কোনো স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু সেই মুসলমান ব্যক্তিটি কীভাবে এক অচেনা হিন্দু পরিবারের আপন হয়ে ওঠেন এবং দীর্ঘ জীবনে কীভাবে তারা শারিরীক দূরত্ব ঘুচিয়ে অন্তরের একাত্মতাকে টিকিয়ে রাখেন। গল্পটি কিছুটা আত্মজৈবনিক বলে প্রতিয়মান হয়। কারণ, গল্পকার নিজেও বরিশালের লোক এবং তিনি কলকাতায় একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন। দেশ বিভাগের পর তিনিও ঢাকায় এসে আবাস স্থাপন করেন, অর্থাৎ আত্মজৈবনিক উপাদান আমরা পেয়ে যাচ্ছি। পরবর্তী গল্প 'বিষমশম্পায়ন'-এ আমরা দেখি গল্পকার এক চরিত্রের অবতারণা করেছে যে গ্রাম থেকে শহরে এসে শিক্ষিত হয়ে বেশ পয়সাওয়ালা হয়েছে। বাবা-মায়ের দেওয়া নাম আহমদ ঢালি পরিবর্তন করে আহম্মদ সিদ্দিকী হওয়ার গল্পে উঠে এসেছে ঢাকা শহরের অনিশ্চিত জীবন যেখানে পাঁচতারা হোটেলের আড়ালে আছে অসংখ্য মানুষ যারা খেতে বা পড়তে পায় না। যারা অনাহারে রাস্তায় ধুকে ধুকে মরে। ওদিকে একদল লোক তাদের পোশাকের চাকচিক্য বাড়ায়। এছাড়াও এ গল্পে লেখক সার্থকভাবে দেখিয়েছেন মধ্যবিত্তদের স্নোবারিগুলো। রুচির নামে তারা কীভাবে বিকৃত-মেকি জীবন যাপন করে, সে চিত্র চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার।

গল্পগ্রন্থে প্রায়ই এসেছে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়। 'অজ্ঞাত সৈনিক' নামের গল্পটি ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ কালরাতের নারকীয় বর্বরতার প্রেক্ষাপটে রচিত। এ গল্পে এক সৈনিকের বয়ানে গল্পকার পাকিস্তানি সেনাদের হামলা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এই সৈনিক কি রাজারবাগ পুলিশ লাইনস-এর নাকি ইপিআর-এর তা যদিও স্পষ্ট নয়। তবে সৈনিকটির পালানোর বর্ণনা থেকে মনে হয় এটা রাজারবাগ পুলিশ লাইনস এ আক্রান্ত কোনো পুলিশ সদস্যর গল্প হবে। যার স্বপ্ন ছিলো বাবা-মা-বউয়ের জন্য কেনা কাপড়-শাড়ি-চুড়ি-গহনা নিয়ে খুব শীঘ্রই ছুটিতে বাড়ি যাবে। এরকম আরো কয়েকজনের স্বপ্ন ও পরিকল্পনা আমরা এ গল্পে দেখতে পাবো। কিন্তু মুহূর্তেই চুরমার হয়ে যায় সব স্বপ্ন। ঘুমের মধ্যেই চিরঘুমে চলে যায় অনেকে। কেউ হয়তো লড়াইয়ের চেষ্টা করে শহীদ হয়। আর কিছুলোক সক্ষম হয় পালাতে। 'প্রতীক্ষা' নামক গল্পে দেখতে পাই একটি গ্রামীণ পরিবার, যেখানে মা-পুত্রবধূ-নাতনীর সংসার। ছেলে থাকে ঢাকা, সেখানে চাকরি করে। সে শীঘ্রই বাড়িতে আসবে বলে চিঠি লিখে জানায়। এ নিয়ে বাড়িতে লেগে যায় ইদের খুশি। সবাই মিলে আয়োজন করতে থাকে নানা রকম। লঞ্চঘাটে গিয়ে প্রতিদিনের প্রতীক্ষা চলতে থাকে সমানতালে। কিন্তু কয়েকদিন পরে খবর আসে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তারিখে পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অনেককে গুলি করে হত্যা করে। লঞ্চঘাটের অনেকে মাকে বলে যে তার ছেলেও হয়তো সেখানে ছিলো। কিন্তু মা মানতে পারে না, সে অপেক্ষা করতে থাকে নাতনীকে নিয়ে। প্রতিদিন লঞ্চঘাটে যায় আর অপেক্ষা করে ছেলের আসার। এভাবে বছর পার হয়, কিন্তু ছেলে আসে না আর মায়ের প্রতীক্ষাও ফুরোয় না। আর আমরা পাঠক অনুভব করতে পারি আমাদের ভাষা শহীদদের পরিবারের লোকজনের সেই সময়কার বেদনা।

এভাবে প্রতিটি গল্পই নতুনত্বের স্বাদ দেবে। এবং একটি বিষয় খেয়াল করা দরকার যে প্রায় প্রতিটি গল্পই লেখা হয়েছে প্রান্তিক-সুবিধা বঞ্চিত তথা 'সাবল্টার্ন'-দের নিয়ে। লেখক সমাজ-রাষ্ট্রের উপর তলার লোকদের তেমন একটা এখানে স্থান দেননি। আমরা যদি তার গল্পগুলোর দিকে একটু নজর দেই, তাহলে গল্পকার মোহাম্মদ কাসেমকে একজন সাবল্টার্ন কণ্ঠস্বর হিসেবে আবিষ্কার করতে সক্ষম হবো। এরকম গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'গ্রহান্তরের নাগরিক', 'রিলিপ সায়েব', 'নিরাপদ আশ্রয়', 'স্মৃতি-বিস্মৃতি', 'চানমিয়ার বাথান', 'নির্বেদ প্রত্যয়'। 'গ্রহান্তরের নাগরিক' গল্পে লেখক বিশাই নামের ছিন্নমূল এক চরিত্রের মাধ্যমে দক্ষিণের জনপদের নদী-ভাঙন কবলিত মানুষের দুর্দশার চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন এবং বলা যায় যে স্বার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চল থেকে ঢাকাগামী লঞ্চগুলোর যে চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তা যেনো আজকের চিত্র। তিন দশক আগের সে চিত্রের সাথে আজকের বরিশাল-ঢাকা লঞ্চের ডেকের চিত্র হুবহু মিলে যাবে। নদী ভাঙনের ফলে কাঙাল হওয়া বিশাই একসময় ঢাকা আসে। কিন্তু কোনো সঙ্গতি হয় না। উল্টো ঢাকার আজব কায়দা ও নিষ্ঠুরতায় বলি দিতে হয় নিজের স্ত্রী-সন্তান। এরপর থেকে সে গ্রামেই থাকে এক চায়ের দোকানির আশ্রয়ে। বিশাই-মকিমের চরিত্রের মাধ্যমে লেখক চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ কবলিত নিপীড়িত মানুষের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন এই দুর্ভিক্ষ যতোটা না প্রাকৃতিক, তার চেয়ে বেশি কৃত্রিম। ধান-চাল গুদামজাত করে কিছু অসাধু ব্যক্তি কীভাবে লাভবান হয় আর দরিদ্রলোকজন কীভাবে ধুকে ধুকে মরে সে ইঙ্গিতও আমরা পাই। এ বিষয় নিয়ে বিশাইয়ের উক্তি উল্লেখযোগ্য, 'মানুষে ভিক্ষা দিবে কী, গ্রামে দারুণ অভাব। কিন্তুক বাজারে তো দেখি মেলাই ধান-চাল। সন্ধ্যায় সয়ের করিয়া আসার পথে মহাজনদের ঘরে-ঘরে দেখি পিল-দেওয়া ধান-চাউলের বস্তা, মিষ্টির দোকান গুলিতে ভারে-ভারে সাজানো নানান রকম মিষ্টি। বেনে-গাঁওয়াল করতে যাওয়ার সময় দেখি কিচ্ছু নাই, সব খালি। এতো সব জিনিস যায় কই, খায় কারা!' অন্যএক চরিত্র মজা করে বলে, 'শোনো নাই, জীনে যে মিষ্টি খায়! গভীর রাইতে জীন আইসা মিষ্টি খাইয়া যায়, আবার কিনিয়া লইয়াও যায়।'

আলোচ্য গল্পে দুর্ভিক্ষ পীড়িত ঢাকার রাস্তার যে বর্ণনা লেখক দিয়েছে তা পাঠে পাঠকের বিবমিষা জাগতে পারে। এরকম দুটি বর্ণনা তুলে ধরা হলো,

> পাশের ফুটপাতে পড়ে রয়েছে একটা মরা মানুষ। ওর মুখটা হাঁ হয়ে রয়েছে। মাছি ভন-ভন করছে মুখে। আর একটা মেয়ে মানুষ পড়ে রয়েছে ওর কাছাকাছি মড়া না জীবিত কে জানে। মেয়ে মানুষটির গা উদোম। বুকের সাথে লেপ্টে একটা শিশু মাই চুষছে।

অন্য জায়গায় আছে এভাবে,

> প্লাটফর্মের ওপাশে একটা লোক সন্ধ্যার আগ হতে পড়ে ধুঁকছিল। হয়তো এতক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। ওখানে কয়েকটা ভাঙ্গাচোরা হাঁড়ি-কুঁড়ির কাছে চার-পাঁচ বছরের একটা ছেলে না মেয়ে সেই বিকেলে মরে পড়ে রয়েছে। ওর একটা চোখ সম্ভবতঃ কাকে ঠুকরে খেয়েছে। দেহের কয়েক জায়গায় ঠোকরের দাগ। দুটো নেড়ি কুকুর ঘুরঘুর করছে ওর আশপাশে। গায়ের লোম ঘোর হলেই হয়তো লাফিয়ে পড়বে লাশটার ওপরে।

কী বিভৎস এই দৃশ্য! লেখক দারুণ মুন্সিয়ানায় শব্দে শব্দে ফুটিয়ে তুলেছেন দুর্ভিক্ষপীড়িত ঢাকার সেই নারকীয় চিত্র।

দুর্ভিক্ষের কথা বারবার ফিরে এসেছে। 'নিরাপদ আশ্রয়' গল্পে রাজু-বিজু নামের ছিন্নমূল দুই ভাইয়ের বেদনাদায়ক জীবন চিত্র ফুটে উঠেছে। রাজুর কথায় আমরা জানতে পারি যে তারা দুর্ভিক্ষের সময়ে তাদের পিতা-মাতাকে হারিয়েছে। পাঠকের বুঝতে হবে না যে এই দুর্ভিক্ষ মানে ১৯৭৪ সালের সেই মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষকেই বোঝাচ্ছে। ওই সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই দুর্ভিক্ষ চলে যেখানে বেসরকারি হিসাবে অনাহারে প্রায় দের মিলিয়ন বা ১৫ লক্ষ মানুষ মারা যায়। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে অনাচার-লুটপাটের ফল হিসেবে এই দুর্ভিক্ষ ঘটেছে বলে জানা যায়। কিন্তু অবাক করার মতো বিষয় হলো এই দুর্ভিক্ষে উল্লেখযোগ্য কোনো রিলিফের ব্যবস্থা হয় নাই। উইকিপিডিয়ায় স্পষ্ট লিখেছে যে রিলিফ দেয়া হয় নাই। মুক্তিযুদ্ধে আনুমানিক তিন মিলিয়ন মানুষ মারা গেলো। আমরা তাদের গভীর বেদনা ও শ্রদ্ধা নিয়ে স্মরণ করি। কিন্তু স্মরণ কালের এই মহাদুর্ভিক্ষের কথা শোনা যায় না বা তা নিয়ে আলোচনা করা হয় না। এটা আসলেই অবাক করার মতো বিষয়। যাহোক, আমাদের গল্পকার মোহাম্মদ কাসেমকে এই দুর্ভিক্ষ স্পর্শ করেছিলো দারুণভাবে। তিনি তার গল্পের মাধ্যমে জানিয়ে গেছেন সেই অভিজ্ঞতার কিছুটা অন্তত।

দুর্ভিক্ষে রিলিফ দেয়া হয় নাই কি পাওয়া যায় নাই বা বিদেশী সাহায্য আসছে কি না তা আমরা জানি না। লেখকের গল্পেও সে ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত নাই। কিন্তু রিলিফ নিয়েও যে আমাদের দেশে রাজনীতি চলে বা বলা যায় রিলিফের টাকা-পয়সা-মালামাল যে লুটপাট হয় সে ইঙ্গিত আমরা পাই 'রিলিফ সায়েব' গল্পে। আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মকসুদ নামক এক

তরুণ। সে ঝড়ে বিধ্বস্ত উপকূলের কোনো অচেনা এলাকায় আসে রিলিফের মালামাল বিতরণের উদ্দেশ্যে। ডাক্তার ঘোষ নামের এক স্থানীয় ব্যক্তির কাছে সে আশ্রয় পায় এবং তার আতিথেয়তাও হয় খুব ভালো। অল্প সময়ের মধ্যেই ডাক্তারের পরিবারের সবাই মকসুদকে আপন করে নেয়। এসবে কোনো ঝামেলা হয় না। কিন্তু ঝামেলা বাধে যখন রিলিফ বিতরণের সময় হয়। ডাক্তার ঘোষের বয়ানেই আমরা বোঝার চেষ্টা করি অবস্থা-

> এসেছেন তো, দেখবেন ঝড়-বিধ্বস্ত অসহায় অনাহারী মানুষ কীভাবে এসে পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আর তাদের তাড়িয়ে দিয়ে মোড়ল-মাতুব্বররা রিলিফের মাল নিয়ে কেমন টানাটানি করে শকুনের মতো- পারবেন সামলাতে?

অন্যত্র ডাক্তার ঘোষ মকসুদকে বলে,

> জানেন মকসুদ সায়েব, অযাচিত ভাবে এতো মানুষ এসে ভিড় করার কারণ কী? ওদের বরাবরকার সন্দেহ। এর আগে যতোবার রিলিফের মাল বিতরণ করা হয়েছে একবারও কাউকে জানানো হয়নি। উড়ো খবর শুনে আগে-ভাগে এসে কেউ সামান্য ওঁছা উদ্বৃত্ত পেয়েছে। পরে যারা এসেছে কিছুই পায়নি, কপালে করাঘাত করে ফিরে গেছে রিক্ত হাতে অদৃষ্টকে অভিশাপ দিতে দিতে। তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছেঃ যা এসেছে দেয়া হয়ে গেছে। পরে ওসব জিনিস বাজারে বিক্রির খবর পাওয়া গেছে। উপর থেকে তলা পর্যন্ত সবার অংশ আছে ওর মধ্যে। ওষুধ, সাবান, ভালো কাপড়, কম্বল এ-সব কিছু বিক্রি হয়েছে, কিছু গিয়ে উঠেছে মোড়ল-মাতুব্বর আর তাদের পেটোয়ারদের ঘরে। যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে, গরীবরা ওসব মূল্যবান জিনিসের কদর জানেনা বলে ওগুলো বিক্রি করে তাদের টাকা দেয়া হবে, কিন্তু এ নাগাদ কেউ কপর্দকও পায়নি। তাই এ-সব লোকের ধারণা, মাল এসেছে। রাতের অন্ধকারে ভাগ বন্টন করে আত্মসাৎ করার মতলবে ওদের ফাঁকি দেয়া হচ্ছে।

ডাক্তার ঘোষের বয়ানে উঠে এসেছে গ্রামের মোড়ল-মাতুব্বরসহ থানার কর্মকর্তদের লোভের গ্রাসে কীভাবে রিলিপের মাল হতে বঞ্চিত হয় অনাহারী দরিদ্র মানুষগুলো। গল্পকার যেনো বর্তমান সময়ের কোনো কাহিনি বর্ণনা করছেন। আজো আমাদের দেশে রিলিফ-টি.আর.-বয়স্ক ভাতা-বিধবা ভাতা ইত্যাদি নিয়ে এই হীন মানুষগুলো নিজেদের পোটলা ভারী করে।

এভাবে গল্পের পর গল্পে মানবজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাকে শব্দের গাঁথুনিতে ফুটিয়ে তোলার সাথে সাথে গল্পকার আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন সামাজিক অনাচার আর বৈষম্যগুলোকে, বিশেষ করে লেখকের কলমে ফুটে উঠেছে দক্ষিণ বাংলার সমুদ্র ঘেঁষা জনপদের চিত্র। যেখানে মানুষ একসময় মগ-হার্মদ-পর্তুগিজ জলদস্যুদের সাথে লড়েছে, লড়েছে জঙ্গলের জানোয়ারের সাথে আর এখনো লড়াই করে চলছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর কিছু লোভী মানুষের হিংস্র থাবার সাথে। তাদের লড়াইয়ের কোনো শেষ আছে কি না সেটা কেবল অদৃষ্টই বলতে পারে।

ভূমিকার শেষে লেখক লিখেছেন, 'নির্বাচিত এই গল্পগুলো সার্থক ও রসোত্তীর্ণ হলো কিনা, সে-বিচার সুধী পাঠকদের।' সেক্ষেত্রে এক কথায় বলা যায়, চমৎকার তেরোটি গল্পের সন্নিবেশনে পরিবেশিত *বিষমক্রান্তি* গ্রন্থটি একটি সার্থক গল্পগ্রন্থ। কিন্তু এরপরো কথা থেকে যায়। কারণ, একবিংশ শতকের বহুজাতিকতার এই সমাজ জীবনে আজকের একজন সাধারণ পাঠক কি আসলেই গল্পগুলোকে এভাবে নেবেন। ধারণা করা যায় যে আজকের পাঠক এতো সহজভাবে নেবে না এবং মোহাম্মদ কাসেমের নাম ও গন্থগুলোর বিস্মৃত হওয়াই সে প্রমাণ দেয়। লেখকের এই গ্রন্থে হালের যাদুবাস্তবতার চমক বা তেমন কোনো চমক নেই। এমনকি তিনি যে রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃতি করেছেন গ্রন্থ ভূমিকায়, সেই রবীন্দ্রনাথের যে দর্শনমিশ্রিত গল্প, তাও এখানে অনুপস্থিত। তাহলে কী আছে এই গল্পগুলোতে, এতোক্ষণের আলোচনায় এতোটুকু অন্তত পরিষ্কার যে, এই গল্পগুলোতে আছে পরিচ্ছন্ন বর্ণনা। লেখক নিজের দর্শন বা মতামত না চাপিয়ে শব্দের মাধ্যমে গল্পের আঙ্গিকে বর্ণনা করেছেন দেশ-সমাজ-রাষ্ট্রের চিত্র, দুর্ভিক্ষের পরিবেশ, সাবল্টার্ন মানুষের জীবন, দক্ষিণবাংলার সাধারণ মানুষের জীবনযাপন ও বঞ্চনা এবং এই গল্প ও বর্ণনায় লেখক এতো পরিচ্ছন্ন যে পাঠের সাথে সাথে যেকোনো পাঠকের মনের চোখে ফুটে উঠবে সে দৃশ্য। আর এখানেই লেখকের বা গল্পের সার্থকতা ফুটে উঠেছে। গল্পকার অবশ্য প্রথমেই ছোটোগল্প সম্পর্কে তার ভাবনা তুলে ধরেছেন, 'ছোটো-গল্প- গল্প এবং ছোটো। সমাজ-জীবনের ছোটো-ছোটো ঘটনা নিয়ে এর কারবার। সমাজের ওপর থেকে তলা পর্যন্ত সব ঘটনায় আকীর্ণ-শুধু ঘটনার রাশি। ওই সব ঘটনা আর বিষয়বস্তুর নিবিড় সম্পর্কে গড়ে ওঠে গল্প। সে-সব ঘটনা অতি সাবধানে ধরে ছোটো-ছোটো আকার ও আঙ্গিকে কথার মালা গেঁথে গল্পের মতো রসালো করে বাস্তব রূপ দিলে হয় রসোত্তীর্ণ সার্থক ছোটো-গল্প।' ছোটোগল্প বিষয়ে লেখকের এই মতামতের সাথে যদি আমরা একমত হতে পারি, তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যায়- *বিষমক্রান্তি*র সবগুলো গল্পই রসোত্তীর্ণ সার্থক ছোটোগল্প।

আমাদের একালের গ্রন্থকথা

অন্যদের তর্কে ঢুকে পড়ি: ক্ষুদ্র কাঠামোতে বিস্তৃত পসরা

কাব্য কাপালিক

[সরদার ফারুক খুলনা শহরের খালিশপুরে জন্মগ্রহণ করেন ৯ নভেম্বর ১৯৬২ সালে। তার পৈত্রিক নিবাস বরিশাল শহরের কাশিপুর এলাকায়। তিনি পেশায় একজন চিকিৎসক। ছাত্রজীবন থেকেই প্রগতিশীল ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখছেন। ১৯৮০ সালে বরিশালের অধুনালুপ্ত *সাপ্তাহিক লোকবাণী* পত্রিকায় প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে শামসুর রাহমান সম্পাদিত *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, *দৈনিক দেশ*, *সংবাদ*সহ দেশ-বিদেশের নানা পত্র-পত্রিকা, সাহিত্য সাময়িকীতে তার লেখা কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সরদার ফারুকের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ- *আনন্দ কোথায় তুমি* (২০১২), *পড়ে আছে সমুদ্র গর্জন* (২০১২), *উন্মাদ ভূগোল* (২০১৩), *দীপলি অপেরা* (২০১৩), *ও সুদূর বীজতলা*, *মাঠের গম্বুজ* (২০১৪), *দূরের জংশন* (২০১৫), *অন্যদের তর্কে ঢুকে পড়ি* (২০১৫) প্রভৃতি।- সম্পাদক]

অন্যদের তর্কে ঢুকে পড়ি কবি সরদার ফারুকের সপ্তম কাব্যগ্রন্থ। অনুপ্রাণন প্রকাশন থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালে প্রকাশিত পাঁচ ফর্মার এ-গ্রন্থে ৭২টি কবিতার সংকলন করা হয়েছে। দুএকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে কবিতাগুলো আকৃতিতে বেশ ছোটো (পাঁচ থেকে বারো লাইনের মধ্যে)। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুকাব্যের ঢঙ এখানে অতোটা প্রকট নয়। তবে 'কবিতিকা' শব্দটির আভিধানিক অর্থের সাথে আমরা এই কবিতাগুলোকে মেলাতে পারি। এক্ষেত্রে পাঠককে মনে রাখতে হবে যে *অন্যদের তর্কে ঢুকে পড়ি* গ্রন্থের কবি সরদার ফারুক কোথাও কবিতা কাঠোমোর কোনো আলাদা নামকরণ করেননি। হয়তো তিনি কবিতার ব্যাপারে শ্রেণিকরণ পছন্দ করেন না। সেক্ষেত্রে আমাদেরও উচিৎ হবে কবির পথই অনুসরণ করা এবং এই আলোচনায়ও সর্বত্র কবিতার আলোকেই বিবেচনা করা হবে *অন্যদের তর্কে ঢুকে পড়ি* গ্রন্থের কবিতাগুলো।

'বিপজ্জনক আলোর মত নিজের কবিতায় জ্বলজ্বল করছেন কবি সরদার ফারুক।' বইয়ের ফ্লাপে লিপিবদ্ধ এ-বাক্যটির মর্ম বুঝে উঠতে পাঠকের জানা দরকার কবির সাহিত্য-যাত্রা সম্পর্কে। সরদার ফারুকের প্রথম কবিতা ছাপা হয় ১৯৮০ সালে, অর্থাৎ এখন থেকে ৩৭ বছর পূর্বে এবং সেই থেকে আজো তিনি লিখে যাচ্ছেন। আমরা যদি আবির্ভাব কাল হিসেব করি, তাহলে তিনি আশির দশকের কবি। কিন্তু পাঠক জেনে অবাক হবেন যে সরদার ফারুকের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *আনন্দ তুমি কোথায়* প্রকাশিত হয় আগুনমুখা প্রকাশনী থেকে ২০১২ সালে। বিষয়টা একটু অস্বাভাবিক লাগতে পারে। তবে পাঠকের মনে রাখতে হবে যে এমন উদাহরণ বাংলা কাব্য চর্চায় নতুন নয়। আরো অনেক লেখকের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটেছে যে আবির্ভাবের বহু পরে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কথাগুলো এ-কারণে বলা হলো, যাতে নবীন পাঠক বুঝতে পারেন কবির বিরতিহীন কাব্যযাত্রা সম্পর্কে। তিনি আশির সেই সাবজেক্টিভ-ন্যারেটিভ কাব্য-ফরম থেকে শুরু করে নব্বই-শূন্যের শব্দজট পেরিয়ে বর্তমান একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে নৈরাজ্যিক কবিতা-কাঠামোতে উপনিত হয়েছেন। একই সাথে নিজের তারুণ্য ধরে রেখে সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে আরো আরো শাণিত করেছেন কবিতার শরীর। এ-রকম সময়ের সারথি এক কবির কাব্য সাধনার ফসল *অন্যদের তর্কে ঢুকে পড়ি* যা তরুণতম কবির মনেও ঈর্ষার জ্বালা বাড়াবে বলে ধারণা করা যায়।

অন্যদের তর্কে ঢুকে পড়ি শিরোনাম দেখে কাব্যবোদ্ধাদের কারো কারো ভ্রু কুঞ্চিত হতে পারে। মনে হতে পারে অকাব্যিক শিরোনাম বা অতি সাধারণ। কিন্তু আমরা তো জানি যে কবি যদি সাধারণের কথা না বলতে পারেন তবে তিনি কালের পরিক্রমায় কেমন ব্যর্থ হয়ে ওঠেন। তাছাড়া তর্ক রেখে আমরা যদি একটু গভীরে তাকাই তাহলে বুঝতে পারবো শিরোনামের স্বার্থকতা; বুঝতে পারবো যে প্রতি মুহূর্তে আমরা আত্মস্বত্ত্ব হারিয়ে কীভাবে অন্যদের তর্কে ঢুকে পড়ছি, কীকরে প্রতিদিন নিজেকে বিকিয়ে দিচ্ছি সস্তা কারবারে। আত্মসচেতন হয়ে আত্ম-উৎকর্ষ সাধনের পরিবর্তে আমরা ঢুকে পড়ছি অন্যের তৈরি করা প্রপাগান্ডার ভিতর, জড়িয়ে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত নোংড়া কাদাছোড়াছুঁড়ির মধ্যে। কিন্তু নিজেরা তা উপলব্ধি করতে পরছি না এবং এ থেকে বের হতেও পারছি না। তাই এগিয়ে এসেছেন সচেতন কবি সরদার ফারুক। কাব্য শিরোনামের মাধ্যমে আমাদের চেতনা জাগানোর চেষ্টা করছেন। আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন-

> কখনো কখনো ভুল করে
> অন্যদের তর্কে ঢুকে পড়ি
> তারপর দেখি বেরিয়ে পড়েছে সাপ
> আমাকে কিনতে বলে দেয়াল-আয়না
>
> [আলিঙ্গন/ পৃ: ৭০]

কবি এখানেই থেমে যাননি। একই কথার প্রতিধ্বনি দেখতে পাই 'অন্যদের বাড়ি' কবিতায়ও-

অন্যদের বাড়িতে কী চাও?
ক্রিম-বিস্কুটের স্বাদ জিবে জড়িয়েছে
এরপর চায়ের পেয়ালা

বেশিক্ষণ থেকো না এখানে
বোকাবোকা হাসি, তোষামোদ
তোমার কি খারাপ লাগে না?

প্রতিবেশি বাগানে মাধবী
তুমি তাতে জল ঢেলে লোক হাসিয়েছো
[অন্যদের বাড়ি/ পৃ: ৬৪]

গ্রন্থ শিরোনামের মতো *অন্যদের তর্কে ঢুকে পড়ি* কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতায় আমরা দেখতে পাবো বক্তব্য প্রকট হয়ে উঠেছে। গ্রন্থের প্রথম কবিতার প্রথম লাইন 'লিখে খাওয়া যাবে না এখানে।' যেকোনো পাঠকের কাছেই স্পষ্ট কোনো বক্তব্য। কবিতাটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কবি একজন লেখক প্রতিনিধি, যিনি বর্তমান সময়ে লেখকদের দুর্দশায় বিক্ষুব্ধ, আপন মনেই প্রকাশ করছেন তার সেই ক্ষোভ-

লিখে খাওয়া যাবে না এখানে। খাওয়াদাওয়া সেরে লিখে যেতে পারো
কাকে বলে গ্রামসিংহ, কোন্ গাছটির নাম উলটকম্বল- সেসব না জেনে
রচনায় উদ্যত হয়েছো!
[পদাবলী/ পৃ: ০৯]

আমরা সাধারণ পাঠকো সহজেই বুঝতে পারি কবির দুঃখ এবং তার কবির সাথে একাত্মতা পোষণ করি। বর্তমান কর্পোরেট বাস্তবতায় একজন লেখক যে কতোটা অবমূল্যায়িত বা অমূল্যায়িত, এমনকি পদে পদে তাকে পোহাতে হয় দুর্দশা। এখানে লেখার মূল্য ক্যানভাচারের তাবিজ-কবজের মূল্যও পায় না। তাই সচেতন কবি লেখকদের হুশিয়ার করছেন যেনো তারা শুধু লেখার উপর নির্ভর না করে উপার্জনের অন্য কোনো উপায় খুঁজে নেয়। পেট সামলাতে পারলে তারপর লেখালেখি করা যাবে। কিন্তু পেট সামলাতে না পারলে তো প্রাণটাই যাবে। আলোচ্য গ্রন্থে এমন সচেতনতামূলক বা বক্তব্য প্রধান কবিতার সংখ্যা কম নয়। আরো কয়েকটার উদাহরণ দেয়া হলো-

১.
হেরে যাওয়া লোকদের ক্লাউনের মতো লাগে, ছুঁড়ে ফেলা রুমালকে
যেভাবে ক্লেদাক্ত মনে করা হয়।
[হেরে যাওয়া লোক/ পৃ: ১৮]

২.
স্নানঘরে সকলেই আশালতা কিশোরকুমার
চন্দন-সাবান- জমাট সাগর যেন, গলে গিয়ে
কেমন সফেন!
[স্নানঘরে/ পৃ: ৮৩]

৩.
অক্ষরবৃত্তের কারাগার থেকে বেরিয়ে পড়েছি। শব্দমোহ, বাক্যের পাপ
অচল মুদ্রার মতো ছুঁড়ে ফেলি পথে-
[আখেরি দস্তান/ পৃ: ৫৩]

৪.
আর কিছু সেখাতে এসো না
ইচ্ছে হলে রাতের পোশাকে চায়ের দোকানে যাবো
'ভাবমূর্তি' শুনলেই হাসি পায়
[ভাবমূর্তি/ পৃ: ৫৬]

৫.
নিজের শহর নিয়ে অভিমান পুষতে হয় না
হয়তো তরুণ তুর্কী তোমাকে চেনে না, অগ্রজেরা গর্দনের ভারে
সোজাসুজি সামনে তাকিয়ে, ডানে-বায়ে ঘুরে তোমাকে দেখেনি
[নিজের শহর/ পৃ: ৭২]

আমরা আগেই জেনেছি যে আমাদের কবি সরদার ফারুক কবিতার বেশ কয়েকটি বাঁক বদলের সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভ করে বর্তমান গ্রন্থে এসে উপনিত হয়েছেন। এই বাঁক বদলের তথা কাব্য বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের অন্যতম উদাহরণ হলো কবিতায় প্রকট বক্তব্য উপস্থাপনের রীতি। এবং আমরা দেখলাম যে কবি সেই অত্যাধুনিক কবিতা রচনায় অনেকখানি সফলতা লাভ করেছেন। কিন্তু তাই বলে তিনি কাব্য উপাদানের মৌলিক বিষয়গুলোকে কোনোভাবেই এড়িয়ে যাননি বা বলা যায় অস্বীকার করেননি। বরং আমরা যদি মনোযোগের সাথে কবিতাগুলো পাঠ করি তাহলে দেখবো কবি সরদার ফারুক অল্পকথায় কী অসাধারণ দৃশ্যকল্প অঙ্কন করেছেন। 'বাদামি পাহাড়ে পাথুরে বাগান প্রাকৃতিক মনুমেন্ট/ ধুলোওড়া পথের দু'পাশে ছন্নছাড়া ক্যাকটাস।' নিশ্চয়ই এই লাইন পাঠকের সামনে দৃশ্যমান করে তুলবে কোনো নির্জন পাহাড়ি পথ। অল্পশব্দে অঙ্কিত এমন আরো কিছু দৃশ্যকল্প-

১.
পাতার আড়ালে খর্বকায় বাঁদরের চোখ। শিকারীর তীরের চেয়েও
আরো বেশি বিষধর মুখব্যাদানের কারুকলা
.....
আমাদের স্বপ্নে এক ছোটো উড়োজাহাজের মন-মরা পাইলট
মেঘের দৈত্যের সাথে লাড়ে যায়
জলের বোতল ঠোঁটে ছোঁয়ানোর আগে
জীবাণুর সারি খলখল করে হাসে
[পাতার আড়ালে/ পৃ: ২৫]

২.
সোমলতা, ঝুঁকে আছো, বুনো পথে আদিম ঘ্রাণের মাখামাখি
চিতার পায়ের শব্দে সকলেই চুপচাপ, অদূরে মন্দির
[সোমলতা/ পৃ: ২৬]

৩.
... দেয়ালে পুরোনো বাইসাইকেল
ব্রিজের রেলিংয়ে ভর দিয়ে যুবকেরা সিগারেট ফোঁকে
রিকশার হুড তোলা, শুধু ওড়নার রঙ দেখা যায়
পৌষের বিকেলজুড়ে উত্তরের হাওয়া
দূরে শ্মশানের ধোঁয়া পাক খেয়ে বাবলার বনে ঘোড়ে
[নিমফুল/ পৃ: ২৮]

৪.
বাসটা বিগড়ে গেলে কাছে এক জনপদে যাই, সেখানে চায়ের আড্ডা
রঙচটা বোর্ডে দাবা খেলা
জানি, এখানেও চোরাকারবারী ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দেয়-
যেভাবে শহরে মুদ্রণের ঠিকাদার নিজেদের প্রকাশক বলে।
[যাত্রাবিরতি/ পৃ: ৩৬]

অন্যদের তর্কে ঢুকে পড়ি কাব্যগ্রন্থটি এরকম অনেক দৃশ্যকল্পে ঠাসা। স্বল্পভাষী কবি অল্প শব্দে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন সাদাকালো-রঙিন বিচিত্র সব দৃশ্যাবলী। মুগ্ধ পাঠক যেনো কবিতা পাঠেই দেখতে পাবেন সেসব চোখের সামনে। সত্যি বলতে কি দৃশ্যকল্পের সৃষ্টিতে আলোচ্য গ্রন্থে সরদার ফারুক চমৎকার মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন।

উপরের আলোচনায় আমরা *অন্যদের তর্কে ঢুকে পড়ি* কাব্যগ্রন্থে কবি সরদার ফারুকের শব্দ ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ ও দৃশ্যকল্প রচনায় দক্ষতার ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম। এবং একই সাথে আমরা আরো দেখেছি যে বাঁকবদলের কবি অত্যাধুনিক কাব্যভাষা নির্মাণের সাথে সাথে প্রয়োগ করেছেন মৌলিক কাব্য-উপাদানগুলো। এর মধ্যে উপমার ব্যবহার খুব একটা চোখে পড়ে না। দুএকটা নিয়মিত ছন্দের প্রয়োগ ও বেশকিছু কবিতায় রূপকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সেই সাথে দুএক জায়গায় আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগও চোখে পড়েছে। 'পথ', 'পানপাত্র' কবিতায় আছে নিয়মিত ছন্দের ব্যবহার, এমনকি অন্তমিলও পাওয়া যাবে। 'মৃত্যুপ্রচারক', 'গল্পগুচ্ছ', 'মাকড়সা', 'দ্বন্দ্বযুদ্ধ, 'ইতিহাসযান', প্রভৃতি কবিতায় পাওয়া যাবে রূপকের প্রয়োগ। এছাড়া 'এহন আমারে দেইখা' কবিতায় পাঠক আঞ্চলিক ভাষার স্বাদ পাবেন।

উল্লেখিত এমন অনেক কিছুর সমাবেশ কাব্যগ্রন্থ *অন্যদের তর্কে ঢুকে পড়ি* যেখানে কবি সরদার ফারুক অত্যাধুনিক কাব্য-কাঠামোতে প্রকাশ করেছেন মানব অনুভূতির মৌলিক উপাদান প্রেম-কাম থেকে শুরু করে নস্টালজিয়া, প্রকৃতি-টান; শব্দের

ক্ষমতাবলে নির্মাণ করেছেন দৃশ্যের পর দৃশ্য। একই সাথে তিনি যে কতোটা হিসেবি তার স্বাক্ষর রেখেছেন পরিমিত শব্দ ব্যবহারে। যদিও সরদার ফারুক এই কবিতা কাঠোমোর কোনো আলাদা নামকরণ করেননি। হয়তো তিনি কবিতার শ্রেণিকরণ পছন্দ করেন না। যাহোক, কবিতা রচনার দীর্ঘ-যাত্রা-অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্চিত জ্ঞানে মনের মাধুরী মিশিয়ে সাজিয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থটি এবং সেই সাথে আবির্ভাবের সময়কার সেই সাবজেক্টিভ-ন্যারেটিভ ফরম বা নব্বই-শূন্যের শব্দজটকে পেছনে ফেলে নির্মাণ করেছেন নিজস্ব কবিতা কাঠোমো, কাব্যভাষা। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, দুএকটা ব্যতিক্রম বাদ দিলে *অন্যদের তর্কে ঢুকে পড়ি* গ্রন্থের বেশিরভাগ কবিতাই পাঠকের সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম এবং অভিজ্ঞ পাঠকের মনে তা ভালোভাবেই আলোড়ন তুলে আবিষ্ট রাখবে বহুদিন।

অরূপ তালুকদারের *নির্বাচিত গল্প*: স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের সার্থক রূপায়ন

কামরুন নাহার মুন্নী

[অরূপ তালুকদার কবি ও লেখক। সত্তর দশক থেকে এ পর্যন্ত প্রায় নিয়মিত লিখেছেন গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধসহ অনেক ধরনের লেখা। এখনো লিখছেন। পেশায় সাংবাদিক। একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার সাথে যুক্ত আছেন। জন্ম: ৬ জানুয়ারি ১৯৪৪, বরগুনার এক গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ এবং এলএলবি। ১৯৭১ সালে যুক্ত ছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতারের সাথে। উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ, গল্পসংকলন, কলামসংকলনসহ অন্যান্য নানা ধরনের লেখা মিলিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা চৌত্রিশ। বাংলাদেশ ও কলকাতায় কবি ও লেখক হিসেবে বেশ কিছু পুরস্কার পেয়েছেন। সাংবাদিক ও লেখক জীবনের দীর্ঘ বছরগুলোতে তিনি ভারত, থাইল্যান্ড, হংকং, সিঙ্গাপুর ও জাপান ভ্রমণ করেছেন।– সম্পাদক]

শ্রদ্ধেয় অরূপ তালুকদার সেই সত্তুরের দশক থেকে এখন পর্যন্ত জীবনের সুদীর্ঘ পথ যিনি পাড়ি দিয়েছেন সাহিত্য সাধনা করে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধসহ লিখছেন বিভিন্ন ধরনের লেখা। নিজ সৃষ্টির সৌরভে যিনি সমাদৃত হয়েছেন সাহিত্য জগতে, তার লেখার সমালোচনা করা আমার পক্ষে এক রকম ধৃষ্টতা বলা যায়। তাই *নির্বাচিত গল্প* পড়ে অনুভূতি প্রকাশ করছি।

বিভিন্ন সময় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পের মধ্য থেকে আঠারোটি গল্প নির্বাচন করেছেন লেখক। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের কারণে গল্পগুলো বৈচিত্রময়। আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় ঘটনা ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে লেখা 'জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে' এবং 'সেই দু'টি চোখ'। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মানুষের আতঙ্ক, উৎকণ্ঠা, জীবন নিয়ে ছুটে বেড়ানো– বাস্তবতার নিরিখেই লেখক তুলে ধরেছেন। যেমন 'জীবন মৃত্যুর মাঝখানে' গল্পে "আমাদের অবস্থা খুব খারাপ। ... প্রথম দিকে দু'তিন দিন ঠেকিয়ে ছিলাম। পরে আর পারিনি। দুপাশ দিয়ে পেয়ারা গাছগুলি গ্রামের লোক ধরে এনে কেটে সাফ করে ফেলে ভোর থেকে আক্রমণ চালিয়েছে মিলিটারিরা। আমাদের অনেকেই পালাতে সময় পায়নি।"

'সেই দু'টি চোখ' গল্পে মুক্তিযোদ্ধা মনিরুদ্দিন। মুক্তিযুদ্ধে তার সাহসিকতা, আত্মত্যাগ আর বর্তমানে তার সামাজিক অবস্থান– সে সেইসব দেশপ্রেমিকদের একজন যারা কিছু পাবার জন্য নয়, দেশের জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন। নিজে কিছু পাবার জন্য যার কোনো প্রত্যাশা ছিলো না। বুকে ছিলো দুরন্ত সাহস, চোখে ছিলো আগুনের শিখা। কালের চক্রে সে আজ সিএনজি চালক। "সেই তরুণ মনিরুদ্দিন এখন বয়সের ভারে রীতিমতো দুর্বল। শরীর ভেঙে গেছে। গলার স্বরও তেমন পরিষ্কার নয়। অতি সাদামাটা জামাকাপড়। অস্বচ্ছলতার ছাপ সব কিছু মিলিয়ে।"

'রাহুগ্রাস' গল্পের শুরুতেই নিঃশব্দ রাতকে বর্ণনা কৌশলে শব্দময় করে তুলেছেন লেখক– "চারিদিকে নিকষ কালো অন্ধকার বাঁদুরের ডানার মতো ঝুলে আছে। নিচে সশব্দ জলের স্রোত। দূর দিগন্তে কালো ছোপ ছোপ অবয়বে বিশাল বিশাল কিছু পত্রহীন গাছ গাছালির ছায়া ঢেউয়ের মতো জেগে আছে। ঢেউয়ের উপর দিকটায় আকাশ, বোঝা যায়। নিচের দিকটায় গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে গ্রাম আর বাড়ি-ঘর সহ। কিছু দেখা যায় না। শুধু অন্ধকার। নৌকার নিচে জলের শব্দ। রাতের সাওয়ারী ইদ্রিস। অন্ধকার জগতের বাসিন্দা সে। জীবনের বাস্তবতা যাকে একহাত দেখিয়ে দিয়েছে। পাশের বাড়ির লোভী চাচারা নানা কুট কৌশলে এক সময় ছিঁবড়ে করে ছেড়েছে ইদ্রিসকে। তারপর একদিন রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে"। বাঁচার জন্য ইদ্রিস দু'নম্বরি লাইনে যোগ দিয়। সাহসের সাথে লোভ যোগ হয়ে ক্রমশ মিশে যায় অন্ধকার জগতে। শরীরের শক্তি, সাহসিকতায় আধিপত্য বিস্তার করে। তলিয়ে যায় মনের অজান্তে। প্রতি পক্ষের আক্রমণে স্ত্রী কুলসুম খুন হয়। সাজানো সংসার, স্বপ্ন ধুলিসাৎ হয়ে যায়। শৈশবের সেই রাহুর গ্রাস যৌবনেও বিধ্বস্ত করে ইদ্রিসকে। 'পাল ছেঁড়া একটা নৌকার ভেসে যাওয়া' জীবন নিয়ে একাকি পড়ে থাকে ইদ্রিস।

ভালোবাসার নদী শুকিয়ে গেলেও রেখা থেকে যায়। 'মধ্য দিনের গান' গল্পে এই সত্যেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। যৌবনের উষালগ্নে ভালবাসার সূর্যোদয় বাস্তবতার মেঘে ঢেকে যায় আলো। মাহতাব সাহেব ও জীনাত দুজনের আলাদা জীবন। আর পাঁচটা সংসারের মতোই স্বাভাবিক নিয়মে চলছিলো সব। হঠাৎ একদিন পড়ন্ত বেলার সূর্যের শেষ আলোর রেখা নিয়ে সামনে আসে জিনাতের ছোট্ট একটা চিঠি– "একে বারেই কি ভুলে গেলে? কোনো দাবি নেই, সময় পেলে একবার এসো।"

"এতটুকু চিঠি মাহতাব সাহেবের প্রাণের গভীরের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল।" কাউকে কিছু না বলে জীনাতের সাথে দেখা করতে গেলেন তিনি। "মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু যেন ওলোট পালো হয়ে গেল মাহতাবের ... ! জীনাতের একটা হাতের উপর হাত রাখলেন তিনি। স্পষ্ট টের পেলেন সমস্ত শরীর কাঁপছে জিনাতের। তারপর হঠাৎই একসময় ভাবলেন, কাল ভোরেই এখান

থেকে চলে যাবেন তিনি।" ভালবাসা যায়গা মতোই থাক। তবু ফিরে যেতে হবে এতদিনের গড়া সংসারে। সামাজিক সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করলেন লেখক।

মফস্বলের নির্বাচনের বাস্তব চিত্র এঁকেছেন 'মানুষ নিয়ে খেলা' ও 'আঁধার কাল' গল্পে। টাকার ছড়াছড়ি আর পেশী শক্তির প্রতিযোগিতা। নির্বাচনকে ঘিরে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ চাপা পড়ে যায়। আতঙ্ক বিরাজ করে সাধারণের মনে। "পকেটের ভেতরে হাত। মতি একটু দূর থেকে স্পষ্ট দেখছিল কাশেমের মুঠোর মধ্যে রিভলভার। রিভলভার দেখে মতির গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল। একটু পরেই দুটি ছেলেকে ডেকে কাশেম আস্তে আস্তে বলল, 'দেখে আয় কটা পড়ল'।"

'পাখি ও মানুষের গল্পে' বিপন্ন মানুষের জন্য মানবিক প্রশ্ন তুলেছেন লেখক। বাচ্চা হারিয়ে শালিখ পাখির আর্ত চিৎকার আর স্বজন হারা মানুষের আর্তনাদকে সমান্তারাল ভাবে দেখিয়েছেন লেখক। পাখির মতোই সহায়হীন থাকে কিছু সর্বহারা মানুষ। যাদের অসহায় আর্তিতে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে, তবু মানুষের কিছু যায় আসে না। টানটান উত্তেজনা আর নাটকীয়তায় ভরা 'অনেকটা গল্পের মতো' গল্পটি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠকের রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা। কী হবে এরপর? সেই কিশোরবেলায় ন'দশ বছর বয়সের সেই অঞ্জুলিকে দেখছেন লেখক। বিশ বছর পর কলকাতায় তার সাথে দেখা হওয়ায় চেনা-অচেনার দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান হয়েছেন তিনি। আবার যখন অঞ্জুলি চলে গেলো, রেখে গেলো তার পরিচয়, এতে রহস্যেও জট খুললেও গল্পরস আরো বেগবান হয়েছে।

মনের গভীরে অবচেতন মনের চাওয়াকে নিয়ে গল্প 'স্পর্শাতীত'। অভিষেক ও লিলির ছন্দময় দাম্পত্য জীবনে অভিষেকের অসুস্থ বন্ধু সুকান্ত, যে কিনা হাসপাতালে শয্যাশায়ী। টগবগে অভিষেকের দুর্দান্ত ভালোবাসার মায়া কাটিয়ে কখন যে লিলি সুকান্ত'র প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে, সে এক অভাবনীয় ব্যাপার। একজন অসুস্থ মানুষের আর্তিকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে লিলি জড়িয়ে যায় তার ভালোবাসায়। অভিষেকের দিক থেকে লিলির কোনো অভাব ছিলো না। তবু সে সুকান্তকে ভালোবেসে ফেললো। বড় বিচিত্র মানুষের মন। কী সে চায়, আর কী চায় না তা সে নিজেই জানে না।

'সংশয়' গল্পে মাহমুদ, মীনার দারিদ্র ভরা সংসারেও ভালোবাসা উপচে পড়ে। একটা চাকরির জন্য মাহমুদ হন্যে হয়ে ঘোরে। তবু মীনা চায় না শাহেদের ফ্যক্টরিতে মাহমুদ চাকরি করুক। এই শাহেদের সাথেই তার বিয়ে হবার কথা ছিলো। তাই শাহেদ যেচে প্রস্তাব দিলেও, মাহমুদ রাজী হলেও মীনা তার স্বামীকে শাহেদের অধীনে কাজ করতে দিতে সম্মত হলো না। দারিদ্রের মাঝেও আত্মমর্যাদা বোধ তাদের ভালোবাসাকে গৌরবময় করে তোলে।

সন্তান বাৎসল্যের নির্মাণ ছবি 'অন্তর্লীন অপত্যলোক'।

দিন মজুর কোরবান আলী ও জরিনার সন্তান কাশেম। পাড়া জ্বালানো, লোকে তাড়ানো দুরন্ত ছেলে। পরিশ্রান্ত শরীরে ঘরে ফিরেই রোজ শুনতে হয় ছেলের বিরুদ্ধে পাড়াপড়শির অভিযোগ। ন'দশ বছরের কিশোর কিন্তু দুষ্টের শিরোমণি। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে কোরবান লাথি মারে ভাত খেতে বসা কাশেমকে। ভয়ে পালিয়ে যায় কাশেম। সারাটা দিন, সন্ধ্যা, রাত তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজি করা হয়। ছেলের খোঁজ মেলে না। অন্ধকার ঘরে একাকি কাঁদতে থাকে জরিনা। কোরবান তেলের শিশি হাতে নিয়ে বের হয়ে যায়। মধ্যরাতে মা'কে অবাক করে দিয়ে বাপের সাথেই বাড়ি ফেরে কাশেম। পেটে ক্ষুধা নিয়ে যে ছেলে পালিয়ে ছিলো, বাপ তাকে বাজারের হোটেলে পেট ভরে খাইয়ে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। কঠোর শাসনের আড়ালে পিতৃস্নেহের গভীর আর্তিতে ভরা গল্পটি।

যুগ যন্ত্রণার বীভৎস চিত্র 'শ্যামলেন্দু ও নীরার কথা'। ভালোবেসে বিয়ে। তারপর উপড়ে ওঠার সিঁড়ির মতো স্ত্রীকে ব্যবহার করে তাকে বলি দেয়ার মতো নির্মম ঘটনা। অনুতাপের আগুনে শ্যামলেন্দুর পুড়ে যাওয়া মন ঝরে পড়ে গল্পের শেষে। পাঠকের মন বিষাদে আচ্ছন্ন করে।

'নিরুদ্দেশ স্বর্গোদ্যান', 'অপরাহ্নের আলো', 'দগ্ধ পরিজাত', 'গভীরতর ছায়া', 'ভাঙন', 'এলোমেলো বসন্তদিন'– শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি গল্পই আমাদের চেনা মানুষের, চেনা পরিবেশের। তবে বর্ণনাভঙ্গি, ঘটনা বিন্যস, চরিত্র চিত্রণ, সাহিত্য রস সৃষ্টিতে লেখক সুনিপুন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সচেতন চিন্তা ধারায় সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল থেকে গল্পের অবয়ব নির্মাণ করেছেন। তাই গল্পগুলো হয়েছে হৃদয়স্পর্শী এবং বাস্তবধর্মী। গভীর ভাবনা এবং অনবদ্য রচনা কৌশলে *নির্বাচিত গল্প* শ্রদ্ধেয় অরূপ তালুকদারের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের সার্থক রূপায়ণ। তাই সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো গল্পকার হিসেবেও তিনি ধন্যবাদার্হ।

মেঘের ফেরিওয়ালা হাবিবুল্লাহ রাসেল

জিনাত জাহান খান

[হাবিবুল্লাহ রাসেল পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি উপজেলার পঞ্চবেকী গ্রামে মাতুলালয়ে ১৯৮৩ সালে ৩১ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মোঃ ওসমান গণি এবং মাতার নাম দিলারা বেগম। স্থানীয়ভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক লেখাপড়া শেষ করার পর বি.এম. কলেজ থেকে হিসাববিজ্ঞানে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ফজিলা রহমান কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করে তিনি তার কর্মজীবন শুরু করেন এবং বর্তমানে তিনি ওই কলেজেই কর্মরত আছেন। এ-পর্যন্ত তার প্রকাশিত গ্রন্থ: *কান্না নিয়ে যাও* ও *ফেরিওয়ালা মেঘ*, *পঞ্চবেকী*। এছাড়াও তিনি সম্পাদনা করেছেন *অনুভব* ও *জলনীলিকা* নামের ছোটোকাগজ।–সম্পাদক]

মানুষ জীবনকে ভালোবাসে, জীবনে টিকে থাকতে ভালোবাসে। মানুষ ভালো থাকতে চায়। এই ভালো থাকতে গিয়ে মানুষ চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে, হাঁটতে-থামতে জীবনের অনেক প্রয়োজনকে অভিজ্ঞতা কিংবা বাস্তবতার জন্যই মেনে নিয়ে বাঁচে। এর নাম সামাজিক-সাংসারিক জীবন। তাহলে এই বাঁচার সংগ্রামে কাব্যসাধনা কতোটা দরকারি? এখানে শিল্প-সাহিত্যের মূল্য কী? আদৌ কি কোনো মূল্য আছে? এমন অনেক কতোশত প্রশ্ন প্রতিদিন মনের আকাশে ঘুড়ি হয়ে ওড়ে, আবার অনেক উপরে উঠে গেলে সূতা কেটে পতিত হয় একশত প্রশ্নঘুড়ির।

মানুষ জীবীকার প্রয়োজনেই খায়। কিন্তু কবিতাকেও কি এমন প্রয়োজন রূপে স্বীকার করার কোনো সুযোগ আছে? মনে হয় না, মনে হয় না। মন হচ্ছে সমস্ত দেহের নিয়ন্ত্রক। এখানে একজন মেধাবী কবির কাব্য চর্চা নিয়ে বলবো, যিনি তার কাব্যশৈলী দিয়ে ইতোমধ্যেই পাঠকের মনের দরজায় কড়ানাড়তে সক্ষম হয়েছেন। তিনি হলেন কবি হাবিবুল্লাহ রাসেল। তার কবিতাগ্রন্থ *কান্না নিয়ে যাও ও ফেরিওয়ালা মেঘ*। এই কবিতাগ্রন্থটি তেমনি এক জলাধার রঙে ছবি আঁকা ত্বকে ত্বকে কামনার জোছনা যেনো।

কাকান্ধকারে আত্মার রক্তের বন্ধনে
স্বপ্নের জোছনা মরে যায়
হৃদয়ের শীততাপে খামখেয়ালির
বেহালাগুলো বাদক ছাড়াই বাজতে থাকে
সহ্যের মঞ্চে নাচে অসহ্য কষ্টের নর্তকী।

কবির 'মুখচ্ছবি' শিরোনামের কবিতার প্রথম স্তবক এমন। এই কবিতার চিত্রে অন্ধকারের ক্যানভাসে যে এক অদ্ভুত মুখচ্ছবি পাওয়া যায়। আসলে অন্ধকার এতোটাই উজ্জ্বল যে দিনের আলোর থেকেও অপরূপ। যদি আমাদের ঈশ্বর সেই ক্ষমতা দিতো যে আমাদের রেটিনায় অন্ধকারও আলোকিত তাহলে বোঝা যেতো এই অপরূপতা। শুধু যে এমন অদৃশ্য সৌন্দর্য্য নিয়েই কবি তার কাব্যরস সাজিয়েছেন এমন কিন্তু নয়, কাব্যগ্রন্থটিতে ৪৮টি কবিতা আছে এবং আলাদা ভাবে সবগুলো কবিতার স্বাদও ভিন্ন। প্রেম, প্রার্থনা, প্রহসন, যন্ত্রণা, ক্ষুধা, দাসত্ব, প্রজ্ঞাকে নিখুঁতভাবে চিত্রায়ণ করেছেন।

একজন কবি সব পারেন, কবি তার কাব্যকলা দিয়ে জীবনের হাহাকার, প্রেম, পাওয়া না-পাওয়াকে যেভাবে তুলে ধরতে পারেন তা সমাজের অন্য কেউই পারে না। কিন্তু এই কাব্যগ্রন্থটি পড়তে গিয়ে ভালো লাগার পাশাপাশি বারবারই যে বিষয়টি মনে এসেছে তাহলো, কাব্যিক ধারাবাহিকতার দিকে মনোযোগ কম মনে হয়েছে, ফলে একটার পর একটা দৃশ্য যোগ করা হলেও সামগ্রিক কবিতার শরীরে তা মিথস্ক্রিয়া আনতে অনেক ক্ষেত্রেই সক্ষম হয়নি। এরপরো পাঠক এখান থেকে কাব্যিক দ্যোতনা খুঁজে পাবেন বলে বিশ্বাস করি।

সর্বপরি, কাব্য জগতে একজন কবির মনন থেকে সেরটাই আসে। কাব্য জগতে সবাই যে একই সুরে স্বচ্ছ কিংবা নির্মেদভাবে উপস্থাপন করবেন এমন নয়। আমরা কবি হাবিবুল্লাহ রাসেলের কাব্যগ্রন্থ থেকে আরো কিছু কাব্যাংশ পড়লে হয়তো বিষয়টা বুঝতে পারবো...

আরব্য রজনীর দৈত্যের হাতে নেমে আসো হে খাবার
তারারাতে টমি মিয়ার সুস্বাদু রেসিপি হয়ে যাও জোছনা
[সোমালিয়া]

আগুন সাজো তো পুড়ে যাবে
প্লাবন তুলো তো ভেসে যাবে

যে পোড়ায় সেও পুড়ে যায়
যে ভাসায় সেও ভেসে যায়
[মানচিত্র এঁকে দেই ঠোঁটে]

প্রণয়ের পেছনে যতোটা
নিষ্ঠুরতা কিংবা নিষ্ঠুরতার পেছনে
যতোটা যাতনা...
প্রেমের পর্দার পেছনে কতোটা
নিষ্ঠুরতার ঘুম গোপনে জেগেছে তাজমহল!
[সমীকরণ]

অল্প অল্প পঙক্তিতে হৃদয়ে যে আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে এইভাবে একটু একটু কাব্যাংশ বলে হাবিবুল্লাহ রাসেলের সামগ্রিক কাব্যশক্তি বোঝানো যাবে না। আসলে কবিতা বর্ণনার জন্য নয়, কবিতা পাঠ ও অনুভবের জন্য। তাই সব পাঠকদের বলছি, কবির শক্তি বোঝার জন্য পড়ুন *কান্না নিয়ে যাও* ও *ফেরিওয়ালা মেঘ*। শেষ করছি কবির কয়েকটি লাইন দিয়ে– 'আঁধারের কোনো ছলাকলা নেই/ তবু আমার তিল থেকে যে আলো ছড়ায়/ ওকে আমি দস্যু বলে চিনি...'।

চৈত্রের চৌচির পাড়ভাঙা কবি; হাড়ে-পাঁজরে কবিতার প্রত্নসাম্রাজ্য

মিছিল খন্দকার

[সুমন প্রবাহন ১৯৭৬ সালের ১১ নভেম্বর পৈত্রিক নিবাস পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ থানার বাজিতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পরিবার প্রদত্ত নাম মোঃ মশিউর রহমান সুমন। পিতা এম. ওয়াজেদ আলী খানের কর্মসূত্রে তার শৈশব কেটেছে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এয়ারফোর্স কলোনিতে। মা দিলারা বেগম পারুল ছিলেন গৃহবধূ। ঢাকার বড়ো মগবাজারে মীরবাগ হোসন আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির মধ্য দিয়ে ১৯৮২ সালে তার শিক্ষা জীবনের সূচনা ঘটে। পরিবারে তিন ভাইবোনের মধ্যে সুমন দ্বিতীয়। বড় বোন সায়রা জেসমিন সীমু ও ছোটো ভাই তসলিম। ১৯৮৪ সালে তার পিতা কর্মসূত্রে দেশের বাইরে গেলে সপরিবারে তারা গ্রামে ফিরে যান। সেখানে এবং পরবর্তীতে বরিশাল শহরের একাধিক বিদ্যালয়ে তার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। ১৪ বছর বয়সে অষ্টম শ্রেণিতে পড়াকালীন তার কবিতা লেখার হাতেখড়ি হয়। এছাড়া তার নিয়মিত ডায়েরি লেখারো অভ্যাস ছিলো। পিতা দেশে ফিরে আসলে পুনরায় তারা ঢাকায় ফিরে আসেন এবং ক্যান্টনমেন্ট শহীদ রমিজউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৯৪ সালে প্রথম বিভাগে এস.এস.সি. পাশ করেন। এরপর ঢাকা আদমজী ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এন্ড কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৯৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় 'গল্প থিয়েটার' নামক একটি নাট্য সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততার সূত্র ধরে নাট্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। এ বছর জানুয়ারি মাসে এইচ.এস.সি. পরীক্ষার মাত্র চার মাস আগে শাহবাগ মোড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় পায়ে গুরুতর আঘাত পাওয়ার কারণে এইচ.এস.সি. পরীক্ষা দেয়া হলো না। এখানেই সুমনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে। ১৯৯৮ সালে ঢাকা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে ফিল্ম এ্যাপ্রোসিয়েশন কোর্স ও পাঠচক্রে সক্রিয় সদস্য হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে আগ্রহ থাকায় তিনি অ্যাস্ট্রোনোমিকাল এসোসিয়েশনে সম্পৃক্ততা তৈরি হয়।

১৯৯৯ সালে শাহবাগ আজিজ সুপার মার্কেট থেকে প্রকাশিত *কালনেত্র* নামক একটি ছোটোকাগজের লেখক গোষ্ঠির সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। ২০০২ সালে সুমন প্রবাহন ও তার দুই কবি বন্ধুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ছোটোকাগজ *বুকটান*। এছাড়া শামসুর রাহমান ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত *দুই বাংলার ভালোবাসার কবিতা* সংকলনে তার কবিতা মুদ্রিত হয়। এসময় *কালনেত্র* ও *বুকটান* ছাড়াও আরো বেশকিছু ছোটো কাগজে তার কবিতা নিয়মিত ছাপা হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- *ভূমিজ*, *ধ্রুবতারা*, *আরণ্যক*, *ঢোল*, *সমুদ্দুর*, *লাস্টবেঞ্চ*, *শালুক*, *চিলেকোঠা*, *ক্যাথারসিস*, *সময়কাল*, *কাঠবিড়ালি*, *আগুনমুখা*, *নন্দন*, *মান্দার* প্রভৃতি। দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের সাহিত্য সাময়িকীতেও তার কবিতা প্রকাশিত হয়।

২০০১ সালের ২৪ আগস্ট কবি সুমন প্রবাহনের মা দিলারা বেগম পারুল আকস্মিক মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুকে সুমন স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। ফলে মানসিক ভাবে চরম বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রাণবন্ত ও সদা হাস্যোজ্জ্বল এই কবি তার জীবদ্দশায় মাতৃবিয়োগের শোক কটিয়ে উঠতে পারেননি আর। ২০০৩ সালে তার বিষণ্নতা ও অবসাদগ্রস্থতা প্রকট আকার ধারণ করে। এরপর দীর্ঘকাল নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেন আত্মমগ্ন এই কবি। একাকি নিভৃতবাসে কবিতার খাতাই হয়ে ওঠে তার একমাত্র সঙ্গী। পাশাপাশি স্কেচখাতায় কলম, পেন্সিল ও প্যাস্টেলে চলে আঁকাআঁকির কাজ। এসময় প্রায়শই তাকে অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন থাকতে হতো। এভাবে নিঃসঙ্গ থাকতে থাকতে ২০০৮ সালের ১৯ এপ্রিল দুপুরে নিজের ঘরে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন কবি সুমন প্রবাহন। পরদিন ২০ এপ্রিল সকালে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে তার মায়ের কবরেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। মৃত্যুর পরে সুমন প্রবাহন স্মরণ প্রয়াস নামে বন্ধুরা প্রকাশ করেন তার একমাত্র কাব্যগ্রন্থ *পতন ও প্রার্থনা* (জুন ২০০৮)- সম্পাদক]

নিয়তই সন্ত্রাস, খুন, দুর্ঘটনা। নৈরাজ্য সর্বত্র। ঋতুতে, বোধে, নৈতিকতায়- নদী ভাঙনে ভিটে বিলীনের অসহায়ত্ব। বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, হৃদয় দূষণ- দূষণ মহামারি ছড়িয়ে পড়ছে দশদিকে। বাতাস ফেরারি হয়ে ছোটে; আসে ঝড়, সাইক্লোন। দিনপঞ্জিতে বসন্ত আসে, যায়... ফোটে না ফুল, ডাকে না কোকিল, বয় না বাতাস- শুধুই নাভিশ্বাস। এমনি দাবানল দগ্ধ সময়ে জন্ম কবি সুমন প্রবাহনের। কোনো স্থূল স্তুতিবাক্যে না গিয়ে চলুন পাঠক *পতন ও প্রার্থনা* রাজ্যে ঘুরে আসি; শুনি সুমনের হৃদয়ের বিমূর্ত এস্রাজে তোলা কাব্য কলতান। দেখি- আমাদের বোধে টঙ্কার তুলে তার কবিতাই বলে দেয় কিনা, সুমন প্রকৃতই কবি ছিলেন।

(ক)
ক'দিন দেখা হয়নি অথচ যেন মহাকাল...
বিকেল বারান্দায় বসে ভাবছি তোমার কথা
সামনের লেকের সিথানে পাশাপাশি দু'টি তালগাছ
দাঁড়িয়ে আছে
তাদের ছায়া জড়িয়ে আছে গোধূলি আলোর জলে
ভাবছি-
কেন যে গাছ জন্ম হলো না
একবার কাছাকাছি দাঁড়াতে পারলে
আর দূরত্বের ভয় থাকতো না।

[বন্ধুত্ব ও দূরত্ব]

(খ)
একাকীত্বের বোধ তৈরির অনেক আগে থেকেই
আমি একা
একা দীঘি একা ঘাট
একা নদী একা পথ।
একা রাতে একা পথে
একা এক একা রথে
পৌঁছে যাই ঈশ্বরের গৃহে
আর কথায় কথায় জেনে যাই
ঈশ্বরের অসীম একাকীত্বও
আমার একাকীত্বের কাছে একা।
[একা]

হ্যাঁ, এভাবেই সুমনের কবিতা বোধকে তুমুল নাড়িয়ে শুভ্র আকাঙ্ক্ষার, ধ্রুব সত্যের মুখোমুখি স্থবির বসিয়ে দেয়।

সময়ের কূটিল ঘাঁয়ে যত্রতত্র জড়ো হয় মানব মাছি, কলতানি চাটে জিভে। যখন ঘাঁয়ের বিস্তৃতি জুড়ে লোভের উপাসনায় মত্ত লোলুপ ভাঁড়ের দল; চারদিকে কফিন মানুষের বিচরণ, তখন সুমনের কবি হৃদয়ে উদ্গিরিত হয় বিষাক্ত লাভাস্রোত...

পৃথিবী, ঠিক পৃথিবী নয়, মানুষ
ঠিক মানুষও নয় মানুষের প্রেতাত্মা
[প্রাসঙ্গিক]

আজও আমি বুঝিনি মানুষকে
মানুষের অন্তঃস্থ হৃদয়
[পতন ও প্রার্থনা]

আর তখন সুমনের কলমে ফুটে ওঠে আর্তনাদ-

জীবনকে বুঝতে না পারার কষ্ট
আমায় ছিঁড়েখুঁড়ে মারে
পোড়াদেশে পড়ে থাকি শবের আঁধারে।
[কবি ও কল্পনা]

কালের বিবিধ সন্ত্রাসে বিষাদ কান্নায় ভারী হয়ে উঠে বাতাস, আর তার হাহাকার স্বরে গুমরে ফেরে সুমনের কবিতা-

খুন হয় কিছু মানুষ ব্যাখ্যাতীত
হয়তো ভেতরে ভেতরে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে
ঘটে যায় মিরাকল
[বারো অগ্রাহায়ন: ১৪১২]

সময় ও স্বদেশ সচেতন কবি টেলিস্কোপ চোখে দেখেন ঘাঁয়ে ব্যাকটেরিয়া-

গণতন্ত্র তুমি আমার
কাছে আর
জনগণের মুখচ্ছবি নও
তুমি গুটিকয় মানুষের আঙ্গুলের ইশারা
[গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ]

যতটা সম্ভব আমি দেখে নিয়েছি
তোমাকে বাংলাদেশ
যেন পথে পথে বিভ্রান্ত তুমি
[গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ]

এবং ধনিকের তালিকায়
ফিদেল ক্যাস্ত্রো এলে

আমি তার মর্ম উদ্ধারে থাকি!
[যেন আমিই ছিলাম]

এতসব কালিক, বৈশ্বিক, মানবিক অসঙ্গতির নির্লজ্জ আস্ফালন ঠেলে গলা উঁচিয়ে সুমন প্রশ্নের ধনুকে ছোঁড়েন তীর-

এ বছর বোমার আঘাতে কতজন মানুষ পঙ্গু হলো
[রাত একটা পনেরো মিনিট]

আমরা কি তবে বিষাক্ত ইতিহাসের
ভিতর দিয়ে দিনযাপনে-
প্রতিদিন মাথায় নিচ্ছি বিষাক্ত ছোবল
[প্রাসঙ্গিক]

শতাব্দীর এ-খণ্ডে উগ্র-সাম্প্রদায়িক বারুদের তীব্র ঠাসাঠাসি, পৃথিবীর বুক পকেটে ঝুলে আছে তুমুল বিপজ্জনক গ্রেনেডের মতো। আর তার বিপরীতে সুমন শান্তিকামী, সার্বজনীন দার্শনিক হয়ে ওঠেন যেনো-

আমি হিন্দু কি মুসলমান সেই প্রশ্ন
আজ আমার কাছে প্রশ্ন নয়
মনে হয় মানুষ আমি
অনেক সংশয় আর ঝড়ে হেঁটে
এই সিদ্ধান্তে আমি স্থির
[বাস]

শারীরিক অন্তর্ধানের পরও বুঝি সুমন বারবার ফিরে আসেন...শোনান তার পুনঃঅঙ্গীকার-

আমি নিজের কবরের পাশে বসে থাকি আর দেখি
মার্বেল দুপুর। জাতি-উপজাতি ভেদ। ভেদে আমার মন নেই।
[বসুন্ধরা]

শেষে মানুষের বিবিধ অতলগামীতায় অভিযোগ তোলেন মানুষেরই কাছে-

গাছেদের কাছে আমার কোন
অভিযোগ নাই!
মাছেদের কাছে নাই!
পাখিদের কাছে নাই
অভিযোগ মানুষের কাছে
[শিরোনামহীন-২]

বন্ধুকে লেখা অপ্রকাশিত চিঠিতে সুমনের হৃদয়ের সরল স্বীকারোক্তি-
'আমি জানলাম আধুনিকতা মানে কপটতা, ক্লেদ, প্রতিহিংসা, দৌড়, দৌড় আর দৌড়। না, আমি গ্রহণ করতে চাই না এই ভণ্ড আধুনিকতা আর ভীষণ থেমে গিয়ে দেখতে চাই এইসব অর্থহীন দৌড় চারপাশের মানুষের।'
ভেতরে বোধের বিদ্রোহ ভারী হতে থাকলে বেহালা বিষাদে ওর কলম বলে-

আমরা সংস্কৃতি শুন্যতায় ভুগে রক্তশুন্য জারজ প্রজন্ম।
আমাদের মাথার উপর চিলের তীক্ষ্ণ চোখে ছোঁ মারার হা-আ-কৌশলে
কূটনাস্ত্রের মহড়া চালায়।
[শুন্য ডানার হ্রেষা]

আর এসব দেখেই ওর দার্শনিক সতর্কবাণী-

তৈরি থেকো শেষ বারুদ-কাঠি
তৈরি থেকো হে বিরাট ধ্বস!
[কেউ নই শুন্য মাতাল]

বাস্তবিকই এই পৃথিবী উনুনে এতসব নৈরাজ্যিক প্রবণতার মাঝে প্রকৃত মননের কবি হয়ে ওঠেন অসুস্থ। মুখশ-মানুষের থেকে ক্রমে দূরে সরে গিয়ে; সীমাহীন নিঃসঙ্গতায় ঈশ্বরকেও হার মানিয়ে শেষে প্রকৃতির কাছে বারবার ছুটে যাওয়ার আকুতি জানান-

পাহাড় কেমন আছে আমি জানি না
দীর্ঘকাল দেখা হয় না
তাকে আমার ব্যাধি দেখিয়ে বলবো
আমি অসুস্থ
[১৯৪২- এ লাভস্টোরি]

অভিমানে বলে ওঠেন-

আমি বরং পালিয়ে
আমার নদীটার কাছে যাবো
বলবো ভুল মানুষ আমি
তোমার জন্য কিছু ভুল ভালোবাসা
নিয়ে এসেছি
[বারো অগ্রহায়ন ঃ ১৪১২]

এভাবেই যন্ত্রণায় দগ্ধ সুমন হয়ে ওঠেন দিনরাত অন্ধকারে জাগরুক পাখি-

দ্যাখো কৃষ্ণ গহ্বরে
একা পাড়ভাঙা পাখি জাগে।
[পাড়ভাঙা পাখি জাগে, একা]

ওর কবিতার ভাষা, কলেবর, চিত্রকল্প এবং বোধের একটা নিজস্ব ঝরঝরে পরিমিত ধরন ছিলো। যেটা আরো পরিপক্ক হচ্ছিল ওরই হাত ধরে। বোধের ভাঙচুর আর নিরন্তর প্রস্তুতির একটা মোক্ষম সময়ে যখন ওর কবিতা সিদ্ধি পাচ্ছিল, তখনই চলে যেতে হলো ওকে। সুমন তো পৌঁছে গিয়েছিলেন নিজস্ব দার্শনিক সত্যে-

যদি দ্যাখো বহিরাবরন
আমি নই অন্য কেউ
যদি দ্যাখো মনের পীড়ানে
আমিই সেখানে স্বয়ম্ভু
খোদার আসনে।
[ভ্যান চালক]

ও তো বাঁচতেই চেয়েছিলো-

জনম জনম সাধনার
এ যে মানব জন্ম
তার সুরটুকু মুছে ফেলতে
এখনও মন সয় না
[স্থবিরতা]

পাল তুমি কোথায়
আমাকে পাল তোলো পাল তোমার পালে
[মনিহীন কাফন মানুষ]

অথচ সুমনকে বলতে হলো-

যখন আমি বুঝতে পারি
তাবৎ ধর্মগ্রন্থ
যখন আমি বুঝতে পারি

মাটির ঘ্রাণ মানুষের সীমানা
পড়তে পারি পাতা ও পতঙ্গ
তখন কে আমার পায়ে
পড়িয়ে দেয় এমন বিভ্রম
[কয়েক মিনিটের সুখ]

বেঁচে থাকতেও কেনো ওকে সময় ও মানুষ থেকে আলোকবর্ষ দূরে সরে যেতে হয়েছিলো হৃদয়ে?

দূরাভাষে দূরে দূরে
তারও থেকে বহুদূরে
আমার মন থাকে
মনে মনে কত কথা
[পরিচয়]

আসলেই, আমরাই ওকে ঠেলে দিয়েছিলাম এক ছায়াপথ থেকে অন্য ছায়াপথে- মৃত্যুতে। যতোবারই গুমড়ে উঠেছে ওর কণ্ঠনালী চিৎকারে, ততোবারই আমরা বাজিয়েছি নৈরাজ্যিক হর্ন, গলায় পেঁচিয়ে দিয়েছি করাল কালের অজগর। আর ওর-

ডুকরে ডুকরে কান্না
ব্যথা ছিল কথা ছিল
বলা হল না
[প্রার্থনা]

সূর্যগ্রহণে কেনো কখনো কখনো সন্ধ্যা নামে দুপুর সময়ে, এর অন্তর্নিহিত কারণ ব্যাখ্যা করবেন জ্যোতির্বিদগণ। কিন্তু একজন সুমন প্রবাহন কেনো বয়সের মধ্য দুপুরে ঘরের সিলিং-এ ঝুলে চিরগ্রহণ হয়ে যান; তার দায় কি আমরা বন্ধু-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র এড়াতে পারবো? কিংবা ওর এই চলে যাবার পর ওকে মনে রাখার প্রয়াসে যারা এতো শশব্যস্ত, তারাই কি ওর ধীরে ধীরে চলে যাওয়াটাকে ত্বরান্বিত করেননি? আমি একথা বলছি কারণ- বিবিধ কুটিলতায় আক্রান্ত ব্যাধিগ্রস্থ এই সমাজ-রাষ্ট্র ও এর মানুষ; আমাদের কি এরপরো শুধরানোর কিছুই নেই? তবে কেনো আরেকজন অনন্ত জাহিদ এক নিঃসঙ্গতার টানেল থেকে অন্য এক নিঃসীম কৃষ্ণ গহ্বরে ঝাঁপ দেন? তবে কি মৃত্যুর পর এইসব চুতমারানা হা-হুতাশ আমাদের কু-চারিত্রিক অসহায়ত্বই প্রমাণ করবে বারবার?

জাগতিক নিঃসঙ্গতার মাঝেও যিনি ছিলেন সুমনের শীতল আশ্রয়, সেই মায়ের মৃত্যু তাকে ভাসিয়ে দিয়েছিলো আগুন-বানের স্রোতে। আর সে কান্নার গোঙানি শোনা যায় ওর কবিতায়-

মায়ের চুলের গন্ধ মনে আসে
অথবা
সাদা বক ওড়ে সাত আকাশের বাঁকে
দুধ-ভাত
হোগল পাতার মাদুরে
মা যদি ডাকে।
[মা]

আর এভাবেই একাকিত্বের প্রগাঢ় আঁধার থেকে মুক্তি পেতে জীবন-ঘুর্ণন থামিয়ে সুমন ঝুলে পড়েন ঘরের সিলিং-এ; ফিরে যান মায়ের দ্বিতীয় জঠরে-

ভূতগ্রস্থ মহাশুন্যে ঝাঁপিয়ে মেলেদি' দু'হাত
শুনশান পতন নামে অস্তিত্বের চরাচরে
পতন ডানার এ ঝাঁপে হারিয়ে ফেলি সময়
বুকের ভিতর ওৎ পাতে সময়হীন মহাকাল
...
অন্ধকার রাতে নিজস্ব নক্ষত্রের পাহারায়

অনেক চেনা কবরের অচেনা অন্ধকারে
কংকালের গলা জড়িয়ে ধরি
মা, আমার গায়ে খুব জ্বর!
[পতন]

শুধুই সুমনের কবিতার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম পাঠককে। কিন্তু আবেগ কি আর সবসময় মনের স্লুইজগেট-এ আটকানো যায়! সুমন নিজেই তো তার এপিটাফ লিখে গিয়েছিলেন মনে হয়; আসুন আমরাও কণ্ঠ মেলাই-

শোকার্ত দিনে আমরা বলবো
বৃষ্টি হোক-
বৃষ্টি হোক ছাতায় মাথায়
বৃষ্টি নামুক জল প্রান্তরে
বৃষ্টি নামুক চোখের পাতায়
[ফিরে]

ওর কবিতা পাঠের পর পাঠক ওকেই ফিরে পাবেন আদ্যোপান্ত; আর বোধের জানালা খুলে দেখিয়ে দেবে একজন প্রকৃত কবির হৃদয়। সকল নশ্বরতাকে ছাড়িয়ে যখন চক্রবালের বিভ্রম মায়া মনে হয়, তখন যাবতীয় অস্থির দৌড় থেকে দূরে সরে এসে সুমনের কবিতায় খুঁজে পাবেন-

পার করি সবাইকে পারাপারে
ভেবো না সংসার বিষাদের চার দেয়াল
ফিরে আসবো যে কোনও দিন
তোমাদের উৎসবে
[সত্য]

এইই তবে সত্য হয়ে থাক।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: লেখাটি ২০০৯ সালে প্রকাশিত মিছিল খন্দকার সম্পাদিত *শ্রীমন্ত* নামক ছোটোকাগজ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে প্রমিত রীতি মেনে বানানে কিছু সংশোধন আনা হলেও অন্য কোনো বিষয় পরিবর্তন করা হয়নি। - সম্পাদক]

হর্সলুক পার্লার : এক অন্ধ রাখালের অনঙ্গ ঘোড়া

রাত উল আহমেদ

[সামতান রহমান ৮ জানুয়ারি ১৯৮৫ সালে পূর্বমাটিভাঙ্গা, ছোটবিঘাই, পটুয়াখালীতে জন্মগ্রহণ করেন। *অন্ধ রাখালের চোখ* কবির প্রথম কবিতাগ্রন্থ, ২০১৭ সালে চৈতন্য প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। *হর্সলুক পার্লার* তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। এছাড়াও তিনি সম্পাদনা করেন সাহিত্যের দুটি ছোটকাগজ- *রসকল* ও *কবিতান*। ব্যক্তিজীবনে তিনি বিবাহিত এবং এক সন্তানের জনক। পেশাগতভাবে তিনি একটি ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে কর্মরত আছেন।– সম্পাদক]

১.

আপাতদৃষ্টে কবি সামতান রহমানকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একভাগ *অন্ধ রাখালের চোখ*, আরেকভাগ *হর্সলুক পার্লার*। সঙ্গতই অন্ধ রাখালের চোখ কতখানি ঘোড়া পায়, তা দেখার ভেলকি খোলা হয়েছে *হর্সলুক পার্লার*-এ। উল্লেখ্য, *অন্ধ রাখালের চোখ* সামতান রহমানের প্রথম কবিতাগ্রন্থ। আলোচ্য বিষয় পরেরটা। কিন্তু না বললে নয় যা, তার কবিতার বাউন্সি শব্দবলগুলো ওপর থেকে ভেসে ভেসে যেভাবে রিভার্স করে, সেভাবে বৌদ্ধিক তাড়নাও ধরে ধরে ঘুরায়, পা উঠালেই তাকে ষ্ট্যাম্পড্। তাকে দিব্যদর্শন করতে চাইলেও কিছুক্ষণের জন্য দিবাচোখ নিশিবর্ণ করে নিলে সুবিধা হয়। স্বশব্দ ভাঙা গড়ার খেলায় *অন্ধ রাখালের চোখ* কবিতাগ্রন্থের ছয় আনা রাখাল আর ছয় আনা বাউলিয়ানার মধ্যমিলে ষোলাআনা। কিছু মন্ত্র থাকে, যার পাঠেই শক্তি। তর্কাতীত থেকেও সংশ্লেষী। বর্ণনার বাইরে থেকেও বহির্মুখী। *অন্ধ রাখালের চোখ* সেই তন্ত্রের দিকে অভিক্ষেপ করে।

যদিও সব বিশেষণ মিলে পারস্পরিক সমার্থ করলে চিত্রহীন কল্পময় দর্শনের এক বিশেষ সামতান রহমানের দিকে যায়। যে ফিলোফ্যান্টাসির বাঁশি নাই যেনো, তারই সুর। ছবি নাই যেনো, তারই চলৎ। একটা কবিতাবই কেবল বই-ই নয়, কবিও। একজন কবি কেবল কবিই নন যে, ব্যক্তিও। এটা কবিরও মনে থাকে। না-হলে তার অবচেতন অংক কষে কষে অংক অস্বীকার লিখবেন কীকরে। *অন্ধ রাখালের চোখ*-এ তাই কীভাবে কবি নিরুদ্দেশ নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠেন তা আঁচ করতে চাওয়ার কবিতাবই।

২.

আলোচ্য বিষয় *হর্সলুক পার্লার*। স্থায়ী বা অস্থায়ী লুক না। ঘন ঘন রূপবদলের আশ্চর্য কিতাব। পাঠমাত্রই পাশের প্রায়লুকারদের পরামর্শ দিতে চাইবে, কোনো প্রকার সার্জারি ছাড়াই চেহারা পরিবর্তন করতে চাইলে যেতে হবে *হর্সলুক পার্লার*। তিন পদক্ষেপে গিয়ে ফেরা যেতে পারে আড়াই পদক্ষেপে।

বাকি পদক্ষেপটুকু কোথায়? পকেটে পথ রেখে চলাচল হাতড়াতে থাকবে।

বইটি পাঠের সপ্রধান আনন্দ হলো, এর সর্বাঙ্গীকরণের সম্মোহনীয়তা। এটি কোনো মেলোড্রামা বা প্রহসন না। নির্মেদ ভাষিক বুনটে প্রতিটি অধ্যায় গল্প হিসেবে যতোটা উপভোগ্য, উপন্যাস বা চলচ্চিত্র হিসেবে পড়তে চাইলেও ততোটাই টানটান। নতুন শ্বাস-প্রশ্বাসমালার কড়া ফোঁড়ন কাটবে। কাব্যকৌতুক হিসেবে পাঠ করতে থাকলেও স্তবকে স্তবকে গদফাটা বুদ্ধিহাস্যরসে জারিত হওয়া যায়। আবার বইয়ের কোথাও এমন তথ্য নেই যে, প্রচুর গুঁতোগাঁতালি প্রবন্ধ হিসেবেও পড়া যাবে না। বইটি কেবল কবিতায় আটক থাকবে, তা আমিও চাইনি। এমনকি মূলত *হর্সলুক পার্লার* কেবল সাহিত্য নয়, সাহিত্য রাজনীতির আত্মআয়নাও। যাতে নিজের মুখও ছাড় পায় না। বইবিমুখ যারা, তাদের জন্যও আছে কৌতূহল উদ্রেককর প্রবেশ দরজা। শুরুর অভিশ্বাসটাই যেমন

> রেসের দশটাই যদি গাধা হয়, যেটা প্রথম হবে, সেটাও এক গাধা।

এইটুকু পাঠের পর শরীর থেকে গাধা ছাড়ানোর জন্য পুরোটা শেষ করতে চাইবে পাঠক।

অসাধু প্রতিযোগের এই যুগে এইরকম বোধই তো টনক তুলে দেখাবে, কার কতোটুকু ঢাকা আছে, কার কিইটা ফাঁকা।

অভিনব অথচ অকৃত্রিম ভাষাবোধভঙ্গিতে লিখিত গ্রন্থখানায় সাধারণ, অসাধারণ, লেখক, অলেখক, অপলেখক সব ধরণের পাঠকের জন্য রয়েছে এপিসোডের পর এপিসোড টান টান উত্তেজনা উপভোগ করবার টাট্টু সুযোগ। দ্বিধাহীন বলতে পারি,

হর্সলুক পার্লার বাংলা সাহিত্য তথা বিশ্ব সাহিত্যের অনন্য সংযোজন। ম্যাগনিফায়ার ধরে দেখলে হয়তো দুএকটা দোষত্রুটিও ধরা যেতে পারে, 'আরও ভালো হতে পারত' টাইপের কিছু বলা যেতে পারে। আসলে কিছু সৃষ্টি আছে যা দোষগুণের ঊর্ধ্বলোক পায়। হর্সলুকের অভিনবত্ব আর সর্বাঙ্গীকরণের বিরাটত্বের কাছে 'আরও ভাল হওয়াটা' নস্যি ।

৩.

বলা ভালো, জর্জ আরওয়েল তার *এনিমাল ফার্মে* যে বক্তব্য, ভঙ্গি, বিষয়, চরিত্র ব্যবহার করেছিলেন, তার থেকে স্বতন্ত্র *হর্সলুক পার্লার* এর একটা জায়গায় মিল, পশু চরিত্রের উপস্থিতি। মানুষও তো প্রাণি। তাহলে মানুষ নিয়ে এতো এতো সাহিত্যকলা যে, তা তো বহু লেখকের এক সৃষ্টিই।

অরওয়েল থেকে তার *হর্সলুক পার্লার* স্বতন্ত্র, অত্যাধুনিক ও বাংলা এতো যে, হর্সলুকের আগুনে আয়োজন সহ এমন বিস্ফোর শব্দ আইডিয়া। আরওয়েল কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নের স্ট্যালিনকেন্দ্রিক জাতীয় রাজনীতির সমাজতান্ত্রিক পটাবস্থান থেকে ফাঁপা অংশগুলো তুলে এনেছিলেন পশু চরিত্রের রূপক ধর্মিতার মাধ্যমে। পশুতে পশুতে চরিত্র-ধারণা তো তারো আগের। ক্ল্যাসিক। সেটা বাংলা ভাষাতেও কমবেশি আছে। বরং এভাবে বলতে পারি, সামতান যে মিথ সৃষ্টি করলেন তা দুর্বোধ্য না অথচ দুর্ভেদ্য। তা গদ্যের পক্ষে হোক আর গদ্যের বাইরে কবিতার পক্ষে হোক। সাহিত্য রাজনীতি বা সামগ্রিক রাজনীতি বা লোকনীতি যাই হোক। এর আবেদন বহুমুখী।

৪.

অধ্যায় এবং পর্বে পর্বে বিভাজিত কবিতাগুলো একটা বিন্দু থেকে সরল বৃত্তের বিভিন্ন পট ও দিক প্রদর্শক হলেও সবগুলো মিলে একটা কবিতাখ্যান। *অন্ধ রাখালের চোখ* কিছু মন্ত্রের একক, *হর্সলুক পার্লার* সেখানে মন্ত্রবান। বানগুলোর প্রক্ষেপণগুলো তীব্র, তীক্ষ্ণধার, উন্নত কমেডির সারসিয়তায় হাজির হয়েও ভাষাকে ইচ্ছামাফিক আছড়ানো গেছে, রগড়ানো গেছে, কাটাছেঁড়া হয়েছে, আবার বাঁধাইও হয়েছে। নিছক চটুল কমেডি না হয়েও রাজনৈতিক জীবনবোধের মর্মখাসা ব্যঙ্গরস। ময়দার খামির ছানার মতো করে ভাষাকে, সময়কে, ভামদেরকে দুহাতে পলিশ করেছেন। যে সকল শব্দ বা শব্দবন্ধগুলো আমরা প্রাত্যাহিক জীবনে উচ্চারণ করে ফেলে দিই, সেইসব তুচ্ছ ও অতিব্যবহারিক ভাগাড়ে শব্দগুলোকে এতো হিসেব করে নির্মাণ-বিনির্মাণ করে তুলেছেন ।

উত্তরাধুনিকের পরের আধুনিককে আমি বলি 'অত্যাধুনিক'। সামতান রহমান সেই কালখণ্ডেই বহমান কবি।

রচনাকালে লেখাগুলোতে এতোই জড়িয়ে গিয়েছিলাম, কবিকে প্রত্যাশা জানিয়েই ফেলেছি দুএকবার যে, *হর্সলুক পার্লার* সাহিত্য রাজনীতি ছাপিয়ে সার্বিক জীবনবোধ হয়ে উঠুক। মূলত এই বইটি আমাদের সাহিত্যরাজ্যে ব্যাঙেরছাতার মতো গজিয়ে ওঠা প্রাসাদকূটের সমালোচন, লোকজীবনের পরিপার্শ্বের সমালোচন, দৃষ্টিভঙ্গির বাতায়ন। সাহিত্য পরিবেশের সমালোচন করতে গিয়ে বিদেশি ভামধারীকেও চিনিয়ে দিতে চান। অনেকদিক থেকেই *হর্সলুক পার্লার* ও তার লেখক আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠেন।

দুঃখসুখের ঝাঁপি এবং আমার একাত্তর: একটি আলোচনা

শ্যামল রায়

[সন্ধ্যা রায়সেনগুপ্তের জন্ম বৃহত্তর বরিশাল জেলার (বর্তমান ঝালকাঠি জেলার) রুনসী গ্রামে ১৯৪৬ সালে। ম্যাট্রিকুলেশন কীর্তিপাশা প্রসন্নকুমার উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৬১ সালে। গ্রাজুয়েশন চাখার ফজলুল হক কলেজ থেকে ১৯৬৫ সালে। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ। ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭২ সালের ৬ জুন পর্যন্ত বরিশাল মহিলা কলেজের অর্থনীতির শিক্ষক। এরপর বিবাহের সূত্রে পাকাপাকিভাবে ভারতের নাগরিক। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায় অবসর জীবন যাপন করছেন। তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।–সম্পাদক]

শ্রীমতি সন্ধ্যা রায়সেনগুপ্তের *দুঃখসুখের ঝাঁপি এবং আমার একাত্তর* শীর্ষক আত্মচরিতমূলক গ্রন্থটি পড়লাম। বলাবাহুল্য মুক্তিযুদ্ধের উপর অঞ্চলভিত্তিক স্মৃতিচারণমূলক লেখা এবং যুদ্ধের ময়দানের ঘটনামূলক অনেক লেখায় সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য। কিন্তু অঞ্চলভিত্তিক ঘটনা প্রবাহকে সংকলিত করে একক প্রকাশনা স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রায় অর্ধসেঞ্চুরীর পরো খুঁজে পাই না। আলোচ্য আত্মচরিতমূলক গ্রন্থটির প্রেক্ষাপট আমার নিজ এলাকার হওয়ায় এই প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করার বাসনাকে এড়াতে পারলাম না।

গ্রন্থে লেখক তার বাল্যজীবন এবং পাঠশালার শিক্ষাক্রম থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভের নানা প্রতিকূলতার বিষয় বর্ণনা করেছেন। লেখক এইসময়ে তার এই সাফল্যের পিছনে যাদের অবদান ছিলো অকপটে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে প্রসংশার দাবি রাখে। তবে তার স্কুল শিক্ষায় পারিবারিক ঔদাসীন্যের বিষয়টি উল্লেখ করলেও এর কারণগুলি বর্ণনা করেননি। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দ্বি-জাতি তত্ত্বের আফিমের নেশায় উজ্জীবিত এক শ্রেণির লোক সর্ব সময়ে মেয়েদের নানা ভাবে উৎপাত করতো। এছাড়া মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা তদানীন্তন পাকিস্তানে সহজ ছিলো না। লেখকের পড়া লেখায় প্রবল আগ্রহ দেখে তার পরিবার স্থানীয় স্কুলে পড়া লেখার সুযোগ করে দিয়েছিলো। তবে এ কথা সত্য যে তার পরিবার পাকিস্তান আমলেও এতোই প্রভাবশালী ছিলো যে লেখকের প্রতি কুনজরে তাকানোর মতো ঐ এলাকায় কারও সাধ্য ছিলো না। স্কুলের বেতন বা বইপত্র ক্রয়ে পারিবারিক ত্রুটি থাকলেও লেখকের পড়া-লেখায় পারিবারিক উৎসাহের কমতি ছিলো না। কিন্তু লেখক এই বিষয়টি তার লেখায় আলোকপাত না করে পরিবারের প্রতি অবিচার করেছেন বলে আমার মনে হয়। তাছাড়া লেখক তার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে রোকেয়া হল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান প্রসঙ্গে খুব সামান্যই বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে তৎকালীন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আবাসিক হলসমূহ ছিলো সারা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। এই বিষয়টি লেখায় এড়িয়ে যাওয়ায় মূল গ্রন্থের ঘাটতি রয়েছে বলে মনে হয়। লেখার শিরোনামের সাথে উল্লেখিত বিষয়গুলি সম্পৃক্ত নয় বিধায় এ ব্যাপারে আরো অধিক কিছু আলোচনা করলাম না।

লেখক ১৯৬৯ এর বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের প্রলয়ংকারী জলোচ্ছাসের কাহিনি উল্লেখ করলেও তা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। লেখকের কথিত মতে কেবলমাত্র ঐ এলাকাতেই জলোচ্ছাস হয়নি। বরিশাল জেলার নিম্নাঞ্চল, তদানীন্তন ভোলা মহকুমা, পটুয়াখালী, হাতিয়া, সন্দ্বীপ বিভিন্ন অঞ্চলে জলোচ্ছাসের প্রভাবে লাখ লাখ মানুষের সলিল সমাধি হয়েছে। ভোলার মনপুরা থানায় মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন লোক বেঁচে ছিলো। কিন্তু পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠী এর কোনো খোঁজই নেয়নি। এখান থেকেই শুরু হয় পাকিস্তানের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের ক্ষোভ এবং দ্বিজাতি তত্ত্বের আফিমের নেশা কাটিয়ে উজ্জীবিত হওয়ার প্রয়াস। ঐ সময় মজলুম নেতা মওলানা ভাসানী উপদ্রুত অঞ্চল ভ্রমণ করে বরিশালের এক জনসভায় বলেছিলেন যে, ওরা (পাকিস্তানীরা) আসেনি। তাই তিনি ক্ষোভে, দুঃখে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবি করেছিলেন। পাকিস্তানকে উদ্দেশ্য করে তিনি আরো বলেছিলেন "লাকুম দিনুকুম ওয়ালিয়াদিন"। বিজ্ঞ লেখক এ বিষয়টি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে গ্রন্থের নামকরণের ত্রুটি ঘটিয়েছেন বলে আমার মনে হয়।

লেখক তার প্রবন্ধের মধ্যে ধারাবাহিকতার ত্রুটি ঘটিয়ে হাঠাৎ করে চৌধুরী কাকা, গোপী ঠাকুর, ড. শিশির মজুমদার, মুকলী এবং হেমায়েতের চিকিৎসা ইত্যাদি নিয়ে এসে গ্রন্থের মূল থিম থেকে পাঠক মহলকে বিভ্রান্ত করেছেন। লেখক তার গ্রন্থের ৪৫ পৃষ্ঠায় ইয়াহিয়া ও বঙ্গবন্ধুর আলোচনার বিষয় উল্লেখ করেছেন। একথা সত্য যে, আলোচনার পর আলোচনা চললেও কোনো সুরাহার আশা পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ২৪ শে মার্চ এর আলোচনার পর ২৫ মার্চ রাত ১২.০০ টার পর পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ, পুলিশ প্রশাসন, বিডিআর এবং আর্মিদের উপর আক্রমণ শুরু করে। এর প্রতিরোধ ছিলো প্রতি আক্রমণ অর্থাৎ স্বাধীনতা যুদ্ধ। কিন্তু লেখক এই বাস্তব সত্যগুলিকে এড়িয়ে ২৬শে মার্চ বেতারে উর্দু কণ্ঠস্বর এবং ২৭শে মার্চে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের স্বাধীনতার ঘোষণার কথা উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়টি একটি অসম্পূর্ণ বক্তব্য যাতে পাঠকদের খাপছাড়া লাগা স্বাভাবিক।

এখানে উল্লেখ্য যে, তৎকালীন আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিলো আওয়ামী লীগের ৬ দফা এবং ছাত্রদের ১১ দফা ভিত্তিক। অর্থাৎ প্রদেশিক স্বায়ত্তশাসন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনও মূলত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠী

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে একাত্ম হয়ে ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বাক্সে বোঝাই করে ভোট দেয়। শোনা যায় যে, বঙ্গবন্ধু ২৪ শে মার্চ রাতের বেলা বাংলাদেশ স্বাধীনতার ঘোষণা চট্টগ্রাম রেডিওর মাধ্যমে প্রচার করেন। কিন্তু পাকিস্তানীদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে সারাদেশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আগুনে স্বাধীনতা আন্দোলন উজ্জীবিত হয়। অপরদিকে সাজোয়া পাকিস্তানী বাহিনী বাঙালি নিধনের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে একের পর এক হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। অনেক অনেক ক্ষেত্রে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে কৌশলগতভাবে কেবল হিন্দু নিধন পরিকল্পনার ভান করে। কিন্তু সচেতন বাঙালিরা দ্বিজাতি তত্ত্বের আফিমের নেশা কাটিয়ে কখন দেশ প্রেমিক স্বাধীনতাকামী হয়ে উঠেছিলো তা পাকিস্তানীরা কল্পনাও করতে পারেনি। বিজ্ঞ লেখক কালস্রোতে এই বিষয়টি ভুলে গিয়ে পাঠক মহলকে নিরাশ করেছেন।

লেখকের গ্রন্থে ৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মুক্তিবাহিনী কর্তৃক ভুল বোঝা-বুঝির কারণে মবরোজখাঁর হত্যার কাহিনিতে লেখকের মর্মবেদনা তার মানবিক গুণাবলির প্রকাশ। কিন্তু এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এরকম অনেক দৃষ্টান্ত আছে। স্বার্থান্বেষীরা অপরিপক্ক মুক্তিযোদ্ধাদের ভুল বুঝিয়ে এ ধরনের বহু ঘটনা ঘটিয়েছে। আমার ব্যক্তি জীবনেও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আজো সেই সব ঘটনার জন্য অনুতাপে অশ্রুসিক্ত হই।

লেখক গ্রন্থের ৫৬ পৃষ্ঠায় রাজাকার, আলবদর এবং দালালদের কথা উল্লেখ করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, মাত্র কিছুদিন আগেও যারা আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প ভাবতো না তারাই রাজাকার, আলবদর, আলসামস ইত্যাদিতে নাম লেখিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের দোসর হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু লেখক এর কারণগুলি উল্লেখ করেননি। তবে আমার মনে হয় নিম্নলিখিত কারণে এই রাজাকার, আলবদর এবং দালালদের সৃষ্টি হয়েছিলো।

১. তখনকার বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামাতে ইসলাম, নেজামী ইসলাম কখনোই দ্বিজাতিতত্ত্বের মতবাদ থেকে এক পা-ও নড়েনি।
২. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসী হলেও অনেকেই দ্বিজাতিতত্ত্বের আফিমের নেশায় উন্মত্ত হয়ে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়নি। তার উপর ভয় ছিলো দখল করা ভূসম্পত্তি যদি পশ্চিম বাংলার মূল হিন্দু মালিকরা ফেরৎ নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে তো বিশাল ক্ষতি।
৩. প্রবল পরাক্রমশালী পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনীকে কখনো হটানো যাবে না এই ধারণা নিয়ে কিছু অরাজনৈতিক বিপদগামী যুবকেরা রাজাকার, আলবদরে যোগদান করে হীনস্বার্থ ও অর্থ উপার্জনের পথ খোঁজে।
৪. সর্বোপরি অর্থনৈতিক কারণ ছিলো মুখ্য। পাকিস্তানী সৈন্যদের ছত্রছায়ায় লুট-পাটের লোভ সংবরণ করতে পারেনি অনেকেই।

কিন্তু লেখক এই ভাবনাগুলো তার লেখায় স্থান দেননি। লেখক মুক্তিযুদ্ধের আত্মকলহে অনেক মুক্তিযোদ্ধার জীবনাবসানের কাহিনি তুলে ধরেছেন। মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রায় ৫০টি বই পড়েও এই আত্মকলহে মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুর তৎকালীন বাস্তব এই বিষয়াদি খুঁজে পাইনি। এই সত্য বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য তিনি প্রসংশার দাবি রাখেন। এছাড়াও লেখক স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের কিছু অনিয়ম ও অরাজকতার কথা এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অপরাপর লেখকদের লেখায় উল্লেখ নেই। এ বিষয়গুলো তার নিঃসংকোচ সাহসিকতার পরিচয়।

তবে এই সব ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথায়ই আসা যাক। এ কথা ঐতিহাসিক সত্য যে, জার্মান সৈন্যরা যখন সোভিয়েট রাশিয়ার পিটার্সবার্গ দখল করে তখন বিপুল ধ্বংসযজ্ঞসহ সেখানকার ষাট বছরের উর্ধ্বের মহিলাদেরও শ্লীলতাহানি করেছিলো। অনুরূপভাবে স্ট্যালিনের কম্যুনিস্ট সৈন্যরা যখন বার্লিন দখল করে তখনো সেখানে বিপুল ধ্বংসযজ্ঞ সহ ষাট বছরের উর্ধ্বের মহিলাদেরও শ্লীলতাহানি করেছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নূরেমবার্গ ট্রায়ালের নামে জার্মান অফিসারদের ফাঁসি দেওয়া হয়। অপরদিকে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসিকায় এটোম বোমা মেরে যে মানবতা বিবর্জিত অপরাধ করা হয়েছিলো তার বিচার কোথায়? ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতার পরবর্তীতে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা রোধ করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে এই প্রচেষ্টায় জীবন দিতে হয়েছিলো মহাত্মা গান্ধীকে। কাজেই বিপ্লব পরবর্তীতে এধরনের ঘটনায় মর্মবেদনা হলেও কিছু করার থাকে না। তবে কেবলমাত্র একজনের কথাই স্মরণ করি। তিনি হলেন আফ্রিকার নেলসন মেন্ডেলা। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ দাঙ্গা রোধ করা সম্ভব হয়েছিলো। লেখকের বর্তমান আবাসভূমি ভারতে নির্বাচনোত্তর যে সহিংসতা, অরাজকতা এবং অমানবিকতা হচ্ছে তা কি রোধ করা যাচ্ছে?

পরিশেষে লেখককে ও প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, যদি না এই লেখাটি প্রকাশ হতো তাহলে বিশেষ করে ঝালকাঠি অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে অনেক তথ্য চির অজানাই থেকে যেতো।

আড্ডারুদের সাহিত্যকথা

সময়ের পাণ্ডুলিপি

অনিতা পাণ্ডে

ভালোবাসো বলে কাছে আসো,
আলতো পায়ে চুপি চুপি,
বুভুক্ষু সময়ের বুকে মাথা রেখে লিখে যাও জীবনের গদ্য পদ্য,
শব্দ শিশিরে কতো সখ্যতা তোমার!
যেতে চাইলেও যেতে পারো না
মনোগহীনের অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছাকে ছেড়ে,
গুপ্তধন পাওয়ার আশায়,
ফিরে এসো বারবার
এ জন্য তুমি সব ছাড়তে পারো,
জমি, জমির মালিকানা আবাসিক বাসস্থানও,
দ্রাক্ষারসের মোহে আবিষ্ট মগ্নতায়
তোমার প্রতিটি অলিন্দ,
যা প্রাগৈতিহাসিক থেকে চলছে,
আগামীতেও চলবে,
রোধ করার উপায় নেই তোমার!
জীবনসঞ্জীবনী সুধায় মোহাবিষ্ট মায়াময় শরীর,
আর এ থেকেই নতুনত্বের উন্মোচন!
একটা কবিতার জন্ম হবে বলে ছুটে আসো,
মাইলের পর মাইল- পায়ে হেঁটে,
সকল ক্লান্তি মুছে যায়,
যখন একটা কবিতা ভূমিষ্ঠ হয়।
স্বীকৃতি পায় বইয়ের পাতায়।
প্রকাশনীর ওটিতে কালো হরফে লিপিবদ্ধ হয়,
তোমার আমার ঔরসজাত পাণ্ডুলিপি।

শঙ্খধ্বনি

অর্ণব আশিক

জনারণ্যে এখন নানা রকমের হালুমের ডাক
দেশের চৌকাঠে আগুন
শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত পথ প্রান্তর
তবুও চাপা আর্তনাদ ক্ষয়িষ্ণু সমাজে;
আগুন জ্বলে কলমের ঠোঁটে
বিশুদ্ধ সূর্য খোঁজে মানুষের বোধ।

ডাহুকের স্বর ডেকে যায় জিঘাংসার সুরে
শুকতারা নিভে গেলে রাতের শরীর জুড়ে
ক্ষত বিক্ষত বুকে মৃত বোধের ঘ্রাণ
ঝিমধরা মানুষ অথবা মৃত কঙ্কাল
মিছিলে শরিক
মুখরিত আকাশে শুধুই শ্লোগান।

অগ্নিগর্ভ শব্দ প্রসবে
বেজে ওঠে শঙ্খধ্বনি
যুবকের কলম অথবা বাঘের হালুম
এক হয় জনারণ্যে,
খোঁজে মাতৃভূমির শান্তি কেবল।

নিরুদ্দেশ

আতিকুর রহমান হিমু

অন্ধকার শব্দের নির্বাণ নির্যাসে পথ আঁকি পায়ে পায়ে
পাতার শরীরে শিশিরের ঘ্রাণ
পৌষের নদী ঘুমিয়ে আছে সিঁথানে
রূপকথার গল্পরা ডানা মেলে সন্ধ্যায়
অতিথি পাখির মৌসুম শেষ, ঝরে পরা পালক
মৃত্তিকায় রেখে যায় বিরহ চিহ্ন-
নদীর ইতিহাস ব্যবচ্ছেদে ভেসে উঠে শহরের ম্যাপ
চিনাবাদামের খোসা ছাড়ানোর শব্দের মতো
স্তব্ধ উপগলিতে লেখা টুকটাক কথা যতো-
আমাদের কোনো গন্তব্য নেই; চোখে চোখে নিরুদ্দেশ।

বিষফল

আনোয়ার হোসেন বাদল

নদী ভাঙনের মতো ভাঙছে আচার, থেমিসের স্ট্যাচু
চর দখলের মতো মানবিক স্তম্ভগুলো পিশাচের আখড়ায় পরিণত হলে
বেদখল হয়ে যায় বোধের জমিন
তবু বারবার পিচ্ছিল মাটিতে জিউস হয়ে উঠতে ব্যর্থ চেষ্টা করি।

আমি পুবে-পশ্চিমে যাই, অন্তরিক্ষ ঘুরে আসি
মেরামত করি লাঙল, ফিরে এসে চাষ করি অন্তর জমিন
সবল বীজ বুনে আশাবাদী হই
অথচ চাষযোগ্য উর্বর জমিনে অবলোকন করি কতিপয় নরক-কীটের খেমটা নাচ।

লুট হয়ে যাওয়া মুসাফিরের মতো একা একা কাঁদি
লুটেরার জাহাজ এখন দূর সমুদ্দুরের ধূসর পথে
অসীম কুয়াশায় ঢেকে গেছে পথের দিশা
শেকড়সহ বোধিবৃক্ষ উপরে ফেলছে কতিপয় রিপাবলিকান অপদেবতা।

পদলেহী দালালেরা পত্তন নিয়েছে মানবিকতার
সতেজ বীজে বেশুমার বিষবৃক্ষের ফলনে আঁতকে উঠি
আমি আর জিউস হতে পারি না
সুতরাং ছায়াপথ-ছাড়িয়ে গ্যালাক্সির পথে ধাবমান হই
পেছনে তাকিয়ে দেখি বিষফলে আমার উত্তর ইতিহাস বিবমিষা খায়।

সন্তরণ

আফরোজা রোজী

একরাশ বিরহ জমেছে মেঘের মতোন ভারী
তোমার দর্শন বিহনে শিলায় রূপ নিয়েছে।
অপেক্ষায় আছি কখন আমি আমার কাব্য কলাকে স্পর্শ করবো।
নিভৃতে করবো সন্তরণ আমার আপনার সনে।
এক নিরব উষ্ণতার খোঁজে সমর্পণ করি যা ছাড়া আমার প্রাণ নিথর হয়।
এক মোহাচ্ছন্নতার প্রতীক্ষা করি যেখানে তোমার অশরীরি স্পর্শ,
অনুরাগ সুর তোলে প্রেমরাগের অতলে।
বিরহের বেদনায় ঘুমানো দুচোখে স্বপ্ন এঁকে দেয়।
মায়াময় সে স্বপ্নে তুমি রাজপুত্র সাত সমুদ্দুর পাড়ি দিয়ে আস
গোলাপ পাপড়ি বিছানো মায়াবতীর কাছে।
হাত জড়ানো হাতে এঁকে যাও ভালোবাসার গল্প।

নীড়ে

আবদুর রহমান

আবার তুমি আসবে ফিরে ধানসিড়িটির তীরে
তুমি নেই আজ তোমার আঙিনায়
আমরা তোমার নীড়ে।
চলে গেছো অজানা দেশে আসবে না আর ফিরে
খুঁজে চলেছি তোমাকে আজ হাজারো কবিতার ভিড়ে।
হাসনা-হেনার সুবাসে তোমার বাগান ছেয়ে গেছে
তাইতো আমি নাম নাজানা গন্ধ বিলাই হেসে।
সময় হওয়ার আগেই তুমি অসময় গেলে চলে
মনটা কেবল ব্যাকুল হয়ে তোমার কথাই বলে।
লিখেছো তুমি প্রকৃতি নিয়ে শিশির ভেজা ঘাস
তুমিই বাংলার প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাশ।

শিহরণ

আব্দুল গাফফার খান

মিষ্টি মুখের হাসি
ডাগর ডাগর চোখ লাগে ভালো
রাঙা ঠোঁটের চুমু কতো ভালো!
কুসুম কুসুম গাল ভেজা শাড়িতে
তোমায় লাগে ভালো ভাবতে
তোমায় লাগে আরো ভালো।
জৈষ্ঠ আষাঢ় নদী ভরা জল
হৃদয় সমুদ্রে ঢেউ যে উথাল
বাসতে তোমায় ভালো জাগে শিহরণ।
কী করি এখন, বলো, কী করি এখন?
চাঁদনী রাতে তারা ঝলমল
তোমার রূপে জ্বলছে এ প্রাণ
চলো ভাব সাগরে ডুবে এখন করি আলিঙ্গন।

শীত

আসমা চৌধুরী

সুখী মানুষের মতো চুল বাঁধে শীতের বিকেল
এই যে পায়ের ওপরে শিশির মাটির ওপরে মৌন,
পৃথিবীর সবুজ পাতারা নেয়ে ওঠে দুপুরের ঘামে।
এই বেলা চিঠি লেখা যায়–
ও দূরের ছেলে, মন কী কেমন করে?

এখন কুয়াশাআঁচলে মুখ ঢাকে নদীর সাম্পান
দূর ফাঁকে ঘোর লাগে, রাত্রির জামা পরে
গান গায় পাহাড়ের সন্ধ্যা
অনেক চুপ থাকা রেখে দেয় আকাশের ঢেউ।

তোমার নিয়তি ভাঙে
কার হাতে কতোটুকু রয়েছে ছলা?
এখন উঠবে চাঁদ, জ্যোৎস্নায় ঘুমাবে
শীতকাল–
ও দূরের ছেলে, কেনো এতো
বৈঠা বেয়ে ছুটেছি তেপান্তরে....

তোমাকে বারবার বলে যাবো

ইকতিজা আহসান

না-গলা জলের চিহ্নাদি ভেদ কর
আর হাওয়াকে বিভাজ্য কর
এইবার তুমি দেখো,
মৃত্তিকার ভেতর থেকে যে সোদা গন্ধের বন্যা বইছে
তার স্বরূপ জুড়ে কোনো বাইনারি ফলাফল বের হয় কিনা!
যদি না হয়, তোমার ভেতরে যে দিগন্ত দেখা যায়
তার সকল কুয়াশা দিয়ে রচিত একটি অমোঘ ভোরবেলাকে
আমি চিরকাল অক্ষর দিয়ে বিন্যাস করে যাব!
রহস্যলোকের দরজা কোনোদিন খোলে না
এই জ্ঞানের চারাগাছ রোপণ করে
তবু রহস্যঘন অঞ্চল জুড়ে বুনে দেবো
আরেক খণ্ড মনযোগের তান!
তোমাকে বারবার বলে যাবো ভেদ করো
সকল অস্থিরতার কেন্দ্র;
যার অন্তস্থ না-গলা জলের প্রবাহ; অবিভাজ্য হাওয়ার প্রসারিত কাঁধ!

ইদানিং তুমি

ইব্রাহীম খলিল

আমার হৃদয়ের ভেতর একটা তুমি থাকো।
সে বাস্তব তোমার মতো ভবিষ্যত নিয়ে ভাবে না, যুক্তি খোঁজে না...
তোমার যে ছবিগুলো আমার কাছে আছে...ওগুলো খুব লক্ষ্মী,
বাস্তব তোমার মতো একটু দেখা দিয়েই চলে যায় না, শুধু চেয়ে থাকে।
আমি হাসলেও চেয়ে থাকে, রাগ করলেও চেয়ে থাকে।
তোমার যে হাতের ছবিগুলো আছে, বাস্তব তোমার মতো লুকিয়ে থাকে না,
পালিয়ে যায় না, সব সময় আগলে রাখে।
বাস্তব তুমি যখন অনেক কঠিন-কঠিন কথা বলো,
ও তখন যুক্তিহীন ভাবে বুকে হাত রাখে। আর বলে, আমি তো আছি।

শুভেচ্ছা রাশিরাশি...

ইয়াসিন হীরা

শুভেচ্ছা রাশিরাশি...
কবিতা ভালোবাসি
ভালোবাসি ছন্দ
আমি এক অন্ধ।

ছন্দময় কবি কথা কয়
যেনো হৃদয় গেঁথে রয়।

কথা বলি বিজনে...
যখন ছিলাম দুজনে
দুজনার অভিমান
ভেঙে করি খানখান

কিং সউদ

মত্ত

দেয়াল তুলে আলাদা করি ডানের সাথে বামকে
বিশ্বাস যতো মুছে ফেলি ডাস্টার দিয়ে, কার কে?
আত্মীয় কি অনাত্মীয় কিংবা হাসি কান্না
আর না আর না!

পানের গায়ের চুন ধুয়ে নেই; ফুলের সুবাস করি লীন
চোখের থেকে মণি তুলে- ঘুম রেখে দেই অমলিন!

হারিকেন ভরা কেরসিন তেল- তবুও জ্বালাই মোম
ফেরাউন মমি পিরামিডে নেই; জীবিত তার ওম!

ঘোড়ার পায়ের তলার লোহা- জাহাজ বানাই তাই দিয়ে
এক নারীতে পুরুষ মত্ত আমি মত্ত নারী পুরুষে!

এক বাজিতে হেরে গিয়ে ভেবেছো আর খেলবো না
হারতে আমার ভালো লাগে; খেলা ছেড়ে যেতে দেবো না।

চিঠি

কৃষ্ণকলি সিফাত

বেনামের চিঠিগুলোর স্বাদ ভিন্নরকম
কিছুটা তিতকুটে, টক আর মিঠের মিশ্রণ।
যদি হতে পারেন মিঠে মিঠে রোদ্দুর-
স্নান করতে আসবে রাজকন্যা
পেরিয়ে সমুদ্দুর...

টক হলে ঝামেলা আছে!
ফুরিয়ে যেতে পারেন যেকোনো সময়!
ভুল করে রাজকন্যার ভাতের থালায়
বসে পড়লে চিঠি থাকবেন না;
হয়ে যাবেন চাটনি!!

বেনামে তিতকুটে চিঠির দশা হয় অস্পৃশ্য...
ঝুলে থাকে আঁধারে- হারিয়ে যায় তেপান্তরে।
নাম-গন্তব্যওয়ালা চিঠিগুলো ভাগ্যবান...
বেনামের মতো বেওয়ারিশ হয়ে হাত বদলায় না বার বার।
বেনামি চিঠিগুলো ঠিক
আমার মতো হয় কেনো বলতে পারেন???

রমাকে

(বাংলা চলচিত্রের মহানায়িকা প্রয়াত সুচিত্রা সেন স্মরণে)

খান কাওসার কবির

রমা,
তোমার নৈঃশব্দ্যে যেনো থেমে যায়
স্রোতোস্বিনী নদীর উত্তাপ
স্মৃতির দু'চোখে যেনো বৈশাখী ঝড়
আষাঢ়ের জল ভরা চোখ
শুকনো পাতাগুলো ঝরে যায়
হেমন্তে ভরা পূর্ণিমায়।
তোমার বিষণ্নতায় যেনো নিভে যায়, রমা
জোনাকির মায়াবী আলো
গ্রীষ্মের জ্বলজ্বলে রোদ্দুরে
নিঃশব্দ পাখিরা।
তোমারই জন্যে রমা-
অঝর ধারায় ঝরে ঝর্ণা
শিশিরের সবুজ দিগন্তে
ঘনকালো মেঘ
বসন্তে যেনো আজ শ্রাবণের বৃষ্টি।
তোমাকে পাবার জন্যে যে রমা-
আরণ্যের আঁধারে যাই হারিয়ে
তোমার সৃষ্টির মাদকে হই আসক্ত
ধীরাজের প্রস্থানে মাথীনের স্বপ্নে হই তৃপ্ত
পাহাড়ি বুনো মেঘে হই সিক্ত।

শেষ দেখা

জান্নাতুল ফেরদাউস শিশির

শেষ দেখা ছিলো বর্ষার দিন
আকাশ মেঘলা, প্রকৃতি অস্থির,
ভেবেছিলে এই বুঝি নামবে বৃষ্টি।
তড়িঘরি করে বসেছিলে গাড়িতে
চলেও গেলে দূরে বহু দূরে।
এমনই সময় আমি
শুধুই তাকিয়ে ছিলাম
তোমার চলে যাওয়ার পথের দিকে।
কিন্তু একটি বারের জন্যও
তাকাওনি পেছনের পথে
এক মুহূর্তের জন্য ভাবনাই
কেউ পথ চেয়ে আছে তোমার।
এতোটুকু চিন্তা হয়নি
কেউ তোমায় ভেবে কাঁদে।
কেনো ভাববে তুমি?
তুমিতো এমনই
সেই ছিলো শেষের সেদিন
আরতো হলো না দেখা।
আমার সময় থমকে গেলো তখন
জীবন জগৎ একাকার।
কখনো ভাবিনি আমাকে নিয়ে
মুহূর্তেই শুধু তুমি আর...
ছিলো সেই শেষের সেদিন
আরতো হলো না দেখা।

ল্যাম্পপোস্ট-৩

ছোটন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

তোমার বেলকনির আলোয় আমি ঝলসে গিয়ে ভুলে যাই নিদ্রাহীন জেগে থাকার ডাইরি; ভুলে যাই এক পায়ে বসে থাকার এইসব বেদনা। কেউ কি জানে রাত বেড়ে গেলে আমারো প্রেম পায় চুপিসারে একা একা! আমারো মনে জাগে অভদ্র শব্দের স্রোত! খুব করে বৃষ্টি এলে আমিও ছুঁয়ে দিতে হাত পাততে চাই তোমার গ্রিলআঁটা বেলকনির মোঁড়ে!

তোমার রোদপোহানো অন্তর্বাসের সাথে মাঝে মাঝে কথা হয় বিষণ্নতার নিশ্চুপ দিন গুলিতে। দিনে আমি চোখে দেখি না জেনে ওরা শুনিয়ে যায় কাজাখস্থানের ঝলমলে বনের গল্প আর প্রবাহমান আশ্চর্য পাহাড় ও রক্ত নদীর ইতিহাস। আমার চোখ জুড়ে জাগে ঘেমে যাবার স্বাদ। পাখি হয়ে বেলকনির বিশ্বস্ত পাহারাদার হবার ইচ্ছে গজায় এলোমেলো লোমহীন তেলতেলে স্টিলের বুকে।

কেউ জানে না আমারো আছে আত্মমূলক কবিতা লেখার একটা অস্থায়ী কাটাকাটি খাতা। আত্মসম্মানে অরুচি এলে আমিও আঁকি অ্যালগরি অব দ্য আর্টস, অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ এবং ভেনাস অব আরবিনোর শালিন ধাচের স্কেচ।

রাত বেড়ে গেলে আমারো প্রেম পায় চুপিসারে একা একা! আমারো মনে জাগে অভদ্র শব্দের স্রোত! খুব করে বৃষ্টি এলে আমিও ছুঁয়ে দিতে হাত পাততে চাই তোমার গ্রিলআঁটা বেলকনির মোঁড়ে! কেউ জানে না-

গোপন নদী

ভাস্কর সাহা

আমার আছে গোপন বলতে একটি নদী
সেই নদীতে একটি মেয়ের একলা ভাসা
দুকূল জুড়ে অন্ধকারের কাঁটার প্রাচীর
একলা মেয়ের ভাবের জগত; কাঁদা হাসা।

সেই মেয়েটির ক্ষুদ্র আকাশ তারায় বোনা
সাঁঝ ঘনালেই ঝিঁ ঝিঁ, ঝাঁঝর, হিমেল মায়া
একলা মেয়ের বুকটা তখন দুরু দুরু
আসবে কি সে? প্রখর তাপের একটু ছায়া?

সেই মেয়েটি অন্ধ বেলায় সামনে দাঁড়ায়
গোপন তাহার যা ছিলো পণ ভাসিয়ে প্রাণে
আমি তখন অনেকখানি আলোর আকাশ
জ্বালবো প্রদীপ রাঙিয়ে দুখের আয়োজনে।

হঠাৎ উধাও মত্ত নদী, পুবের হাওয়া
ঝনঝনানি যা ছিলো সব বুকের তলে
শেষ বিকেলের নম্র গানের চরণধ্বনি
বাজলো মিছেই অন্য সুরের মায়ার জালে

এমনি ভাঙে গোপন নদীর গোপন খেলা
রয় পরে রয় নীরব রোদন, শূন্য থালা।

বস্ত্রহীন সভ্যতায় উদগ্র ভালোবাসাগুলো অশ্লীল

মাসুদ আলম বাবুল

কখনো দগ্ধ এবং রক্তাপ্লুত হয়ে ওঠে শরীর
গিরগিটির মতো রঙ বদলায় ভালোবাসা,
ঋতুর মতো বদলাতে থাকে কথার প্রতিশ্রুতি
কেউ কেউ শূন্যতাকে আকাশ আর সামিয়ানা ভাবে
অন্ধ গলির লাইটপোস্টে দেখে নেয় আলেয়ার মুখ;
গণিকার ধবল দেহে গড়ে ওঠা নাগরিক সভ্যতাগুলো
শিস দেয় মানবিক শিশ্নাংগ অবধি।
তবুও সভ্যতা গড়ে ওঠে, সভ্যতা ভাঙে
সভ্যতার সুগভীর কন্দরে জমা হয়
ভাঙনের সুর
নির্লজ্জের মতো সভ্যতার দেহ থেকে খসে পড়ে
শাড়ি, ব্লাউজ, ব্রা
অসভ্য নগ্ন নৃত্যে এখন
উন্মাতাল পৃথিবীর কোনো ভালোবাসা নেই
খসে পড়া নিষ্প্রভ অরুন্ধতীর আলোতে
আছে শুধুই গ্লানি, অট্টহাসি হো হো হি হি
রক্তাক্ত পৃথিবীতে বস্ত্রহীন সভ্যতাগুলো
কেনো যেনো বড়ই শ্রীহীন, কদর্য;
গণিকা দেহের মতো উদগ্র ও অশ্লীল।

যাযাবর

মাহমুদ অর্ক্য

যখন তুমি সংকট কোণে দাঁড়িয়ে
তখন আমার পূর্ণতা ও বিকাশ ;
আমি যাযাবর
আমি এসে দাঁড়াই আবারো সেই জংশনে
যেখানে শেষ দেখেছি তোমায়,
ঘুরে বেড়াই সারারাত সেই পল্টনে
যেখানে শেষ ছুঁয়েছি তোমায়,
এই ছাতিমের ঘ্রাণ এসে মেশে যাযাবর নাকে- যখন
কাশফুলেরা ঘুমে
ঘুম ভাঙে শরতের মেঘ- শুভ্র আকাশ ঢাকে বেদনার নীল,
রোজ ভোরে দুফোটা কচি শিশির- কচি দূর্বায় ফোটায় যৌবন,
তবু এই শারদে তোমার হাতে কাচের চুড়িতে নামে না সন্ধ্যা,
গুটি গুটি কদমে ফুরোয় না এ-পথ,
যে-পথে হেঁটে গিয়ে বসেছি নদী তীরে
একদল শো-শো বাতাস ছুঁয়ে।
আমি যাযাবর
তৃষ্ণায় কাতর; জ্বলে ধরফর বুক- আমি মাতাল
আঙারে আঙারে দূর্বারা পড়েছে ঢাকা
কিছু অতৃপ্ত চটক এখনো ফেরেনি বনে
আমি যাযাবর
আমি রোজ হাঁটি সেই পুরনো জংশনে।

আত্মার স্কেচ

মাহমুদ মিটুল

কী গান শোনাবো বলো কী আর কবিতা
অন্তরে মরচে ধরা বেদখল এ-ভিটা
কী কথা বলি বলো কী আর আছে বাকি
অবোধ মন আমার দেয় শুধু ফাঁকি

তাল নাই ঢেউ আছে ডিঙা তরতর
পথ ভুলে পথ খোঁজে মাতাল সাগর
লোনাধরা ভাঙা নাও চলছে বিফল
সুর নাই কাঁদে বসে হৃদয়ে গজল

হারিয়ে আলোর তেজ জীবন বরফ
দিন কাটে অনাহুত করে নাম জপ
হাড়িতে চাপিয়ে রোজ বেদনা সংসার
মশলা কষিয়ে করি পাক গন্ধ তার

কী কথা কী গান আর কবিতা শোনাই
ভুল পথে মন খুঁজে দূরে সরে যাই

সেই পাখিটির খোঁজে

মিনতি রানী দাস

হঠাত উড়ন্ত পাখিটি রঙিন ডানা মেলে
এসেছিলো মম দ্বারে
রঙিন ঠোঁট দুটির অপ্সরা ইঙ্গিত
পরীর মতো ডানা মেলে প্রসারিত হলো
দেহ ভঙ্গিমার ইঙ্গিত দিলো
বাসা বাঁধবার অভিপ্রায় জানাল
গৃহ পরিচালক ক্ষিপ্রগতিতে তেড়ে আসলো।
যা উড়ে যা-হেথা নয়, অন্য পথ খোঁজ
মিনতি করে বারংবার আবেদিল
গৃহরক্ষক ততো বারই নিজের খেয়ালে
সমাজের মঙ্গলে লোক নিন্দার ভয়ে
না দিলো আশ্রয় না দিলো ভরসা
উড়ন্ত পাখিটি তার অভিমানী ডানাগুলো
দ্বারে ছুঁড়ে উড়ে গেলো- দূর দূরন্তে।
ঝাপটানো ডানা গৃহীর মনে তরঙ্গ ছড়ায়
রাঙা ঠোঁট দুটো শিহরণ জাগায়
বিরহ জ্বালায় ব্যাকুল হয়ে উঠে
গৃহ থেকে গৃহে লোকালয় থেকে বনে
খুঁজে ফিরে সেই পাখিটি-
নিরাশ মনে ফিরে আসে, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে
সান্ত্বনা নেয়-
হয়তো কোনো একদিন তার দেখা পাবো
হয়তো কোনো একদিন তার ঝাপটানো ডানাটি
বুকে চেপে ধরে বলবো ভালোবাসি, ভালোবাসি।

তুখোর সে তাসুরের নাচ

মোহাম্মদ জসিম

নাচতে এসেছি- বৃক্ষের কন্যাটি এসে চুল খুলে দিয়ে
বলবে–
বাদ্যের ভিড়ে সানাই সানাই কান্নাও খুব চলবে...

এই নাটকে কয়েকটি ভাঁড়– নায়ক মোটে একটা!
টগবগে এক ঘোড়া থাকবে, খোঁড়া থাকবে এক পা...

গীতি থাকবে, ভীতি থাকবে; নেপথ্যে এক লাশ–
ইস্কাপনের বিবির পিছে একান্নটি তাস...

উল্লাস

মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

পশ্চিমে সূর্য ডুবু ডুবু
ঘনিয়ে এসেছিলো সাঁঝ,
তবু ছোট-বড় ছেলেপেলে
ডোবা-ডারা সেঁচে মেরেছিলো মাছ।
স্যাঁতস্যাঁতে কাদা মাটি
করেছিলো মাখামাখি,
বলেছিলো মাছ মারা
আরো কিছু বাকি।
ওই দূরে কাঁদা ঢিল ছুঁড়ে
তাড়িয়ে দিয়েছিলো হাঁস,
একে অন্যের গায়ে কাদা মেরে
করেছিলো উল্লাস!
তারপর সমভাগে হয়েছিলো
মাছ ভাগাভাগি
তা নিয়ে করেছিলো
কতো রাগারাগি।

তবু ভালো থেকো

মুস্তফা হাবীব

আগেও জানতাম দুর্ঘটনার কোনো পূর্বাভাস থাকে না
অকস্মাৎ আগমন, একটি বেগানা ঝড় এসে
স্থির দাঁড়িয়ে গেলো
আমার কবিতার অনিন্দ্য অঙ্গনে,
লণ্ডভণ্ড সব মুক্তক ছন্দ অদৃশ্য বাতাসে
চারপাশের সুহৃদ স্বজন মলিন বদনে দূরে থমকে আছে;
আমি আজ বুঝতে পারছি এসব ইবলিশের কারুকাজ!

দুপাওয়ালা সভ্যতার মুখোশে যে মানুষ সেজে
আমার কবিতা বিলাসে এসে কবিতার পয়ার শুনালো
সে মানুষ ছিলো না, দুর্দান্ত ইবলিশ
আমি না বুঝে স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্তের
সহজপাঠ তার মুখে তুলে দেই।
এখন সে নিজ জীবনের সমস্ত ব্যর্থতার নোনাপানি
কবিতায় ঢেলে দিয়ে জীবনানন্দ সাজে।

মিথ্যা প্রলোভন আর নতুন নতুন সিকোয়েন্স তৈরি করে
বন্ধু, বান্ধব, সরল স্বজনদের মননে ঢেলে দেয় গরল।
আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়,
এতোদিন কোনো ইবলিশই আমাকে পরাস্ত করতে পারেনি,
আয়াতুল কুরসি পাঠে দূরেই রেখেছি তাকে।

ইবলিশ সম্পর্কে যেসব অবিন্যাস্ত তথ্য জানা ছিলো, তা এমন নয়
এবারের কৌশলগুলো অন্যরকম....
বোঝার বিন্দুমাত্র সাধ্য ছিলো না।

আমি সুনিশ্চিত, ধরা যখন পড়েছ হেরে তুমি যাবেই,
আমি ছাত্র তার যিনি আমাকে পথ দেখাবেন
তুমি শুধু ঝড় হয়ে এসে ভেঙে গেলে ডালপালা
হ্যাঁ ইবলিশ, তোমার কাজ তুমি চালিয়ে যাও,
ভালো থেকো নিরন্তর, জনমে জনমে।

উন্মাদ প্রেমিক

রাকিব হাসান

প্রেমের তৃষ্ণায় তৃষিত উন্মাদ প্রেমিক
বোঝে না সামাজিকতা, নীতিকথা, মানে না কঠিন বাস্তবতা,
হয়ে থাকে সারাক্ষণ বিহ্বল দিশেহারা।
এক ঘটি জল দিয়ে গিলে ফেলতে চায়
প্রেমের পথে প্রতিবন্ধকতা
যা কিছু আছে লিপিবদ্ধ গ্রন্থিকায়।

নরম হৃদয়ের প্রেমিক
এসব কিছুই করতে পারে না
পারে শুধু শুন্য আকাশ পানে ফ্যালফ্যাল
করে তাকিয়ে থাকতে
আর তখন ভর করে পাথরের নিরবতা।

আকণ্ঠ ডুবিয়ে প্রেমিক যখন
তার কাঙ্ক্ষিত রত্নের নাগাল পায় না, অথবা
আকাশ ছোঁয়া বাঁধার প্রাচীর
ভাঙতে পারে না, তখন সে
প্রকৃতির সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে,
ঘন অরণ্যে দাঁড়িয়ে থাকে
ডালপালা বিহীন বৃক্ষের আদলে
নিভৃতচারী হয়ে।

স্মৃতিরোমন্থনে ব্যথিত হৃদয়,
একাকি নদীর কিনারে বসে
চোখের লোনাজলের সাথে
মনের কথা গুলো ভাসিয়ে দেয়
স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া
শ্যাওলা, খড়কুটো, কচুরিপানার সাথে।

অবুঝ প্রেমিকের স্বপ্নচারিণী
জলের উপর ভেসে থাকা
অপারগতার ব্যথা,
চোখের কোণে প্রবাহমান
কষ্ট নদীর রক্ত ধারা
না দেখতে পাক,
উন্মাদ প্রেমিকের
মনের কথাগুলো না হয়
নদীর জলে এভাবেই ভেসে থাক!

কবিতা ও জীবন

লিমা ইসলাম

কবিতা বুঝি না- জীবন বুঝি
বুঝি জীবনের প্রতিটি বাঁকে কবিতা লুকিয়ে থাকে
দারুণ দুর্গম পথে জীবনের যাতায়াত
অতীত বর্তমান তার ভবিষ্যতের সরল রেখায় দাঁড়িয়ে
লিখি মৌন উপাখ্যান ;
স্মৃতিময় অতীত, কঠিন বর্তমান আর স্বপ্নীল ভবিষ্যত
জীবনের অনুপ্রেরণা!

জটিল রহস্যের আবর্তন
হাসি কান্নায় ঘেরা
বারবার পেছনে ফেরা
আবার উদিয়মান সূর্যালোক
গায়ে মেখে দাঁড়ায় সংগ্রামী জীবন।

অবশেষে জীবনের নাম দেই পরন্ত বিকেল–
শুয়ে পরা ক্লান্ত রোদ,
শীর্ণ ছায়ায় নিবিড় আলিঙ্গন
কবিতা ও জীবন।

তোমাকে মনে পড়ে

লুনা আহমেদ

তোমাকে মনে পড়ে
খুব বেশি মনে পড়ে
এতো বেশি আর কাউকে মনে পড়ে না,

এতো এতো মানুষ
এতো এতো রঙ
হৃদয় কারো ছবি আঁকতে পারে না।

শুধু তোমাকেই কেনো!
কেনো তোমাকেই?
এমনটা কি তোমার বেলায়ও হয়?

নাকি পাড়ভাঙা নদীর মতোন আমারই
আমার একারই ভাঙে সমস্ত হৃদয়?

আষাঢ়ের থৈ থৈ নদী- জলেজলে পূর্ণ গর্ভ যার
তার বুকও খালিখালি থাকে যখন না আসে জোয়ার।

ঢেউ হয়ে আসলে প্রিয় বুকের গভীরে
কেনো ফুল হয়ে ভাসলে না মনের কিনারে?

স্মৃতিতে একাত্তর

শামীমা সুলতানা

অস্ত্র হাতে যাচ্ছি মাগো শত্রুসেনার তরে
এদেশ মুক্ত করেই তবে ফিরব এবার ঘরে।
চোখ মুছো মা এক ফোঁটা অশ্রু নাহি ঝরে
স্বাধীনতার সূর্য মাগো দেখাবো দুচোখ ভরে।

নাইবা যদি ফিরি মাগো জ্যান্ত তোমার কোলে।
বিশ্ববাসী চিনবে তোমায় শহীদ জননী বলে।
কতো মায়ের বুক যে ওরা দিচ্ছে খালি করে
চুপটি করে দেখছি যেনো রক্তের বারি ঝরে।

যুদ্ধ করে শত্রু সেনাদের তাড়িয়ে দিবো সব
সাথে আছে মায়ের দোয়া আরো আছে রব।
ছিনিয়ে আনবো স্বাধীনতা, মুক্ত হবেই দেশ
থাকবে না আর শত্রুরা, সবাই থাকবে বেশ।

স্বাধীন আজ মুক্ত আমরা সেই খোকাটি কই?
মনে রাখবো তার অবদান যতোদিন বেঁচে রই।
শ্রদ্ধায় আমরা সর্বদা যেনো স্মরণে রাখি তাদের
সালাম আর কৃতজ্ঞতা সকল মুক্তিযোদ্ধাদের।

অনুবাদ

শাহানা শিরাজী

দুঃখ বেদনা অনেক তো হলো
এবার এসো হে প্রিয়জন, কিছু সময় আনন্দে ভাসি
চাঁদের আলোয় পৌষের এ শীতরাত উপভোগ করি...
কোট স্যুট অনেক পরেছো
এবার এসো হে ভদ্রজন, হালকা পোশাকে ছাদহীন ঘরে কিছু সময় কাটাই!
ধরে নাও আমরা পরস্পরের ছাদ, ওম ভাগাভাগি করে
এঁটোঝুটো চিবুই
খালিপায়ে ধুলোওঠা কাঁচা রাস্তায় চলো, দৌড় প্রতিযোগিতা করি।

মাঝরাতে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ি, পায়ের নিচে বিপদে পড়া শোলমাছ ধরে
মাটির চুলায় খবরের কাগজ জ্বালিয়ে ঝলসে নিই।
খুব তো সাবান, শ্যাম্পু, লোবান দিয়ে স্নান করেছো
এবার চলো, কাদা মাটি মেখে কাদা হয়ে যাই-

দুবেলা ছেড়ে একবেলা খাই
মাংস নয়, প্রিয়তম, বেগুন পোড়া, আলুপোড়া সাথে পোড়া মরিচ,
খেতে খেতে নাক চোখের পানি একাকার,
আমরা পরস্পর নাক-চোখ মুছে ছেঁড়া কাঁথা মুড়ে ওম নিই...
এবার ফ্রান্সের কম্বল ছাড়ো,
এসো, নারীর পুরনো শাড়ির তৈরি চিরায়ত কাঁথায় শীত লুকাই
পাটখড়ির বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিই- ভোরের সূর্য চোখ মেলেছে?

প্রতিদান

শফিক আমিন

(মলয় রায় চৌধুরীর সুন্দর মুখশ্রী বলেই বলেছিলেন ‘মাথা কেটে পাঠাচ্ছি যত্ন করে রেখো’)

তার প্রেমিকার মতো তুমিও ভালোবাসো আমায়
অথচ আমার কবন্ধক জড়িয়ে আছে আরো কিছু অযুহাত!
মাথাময় জেগে থাকে সার্কাসপ্রাণি;
আমি বরং হৃদয় কেটে পাঠালাম, যেমন খুশি ভালোবেসো তাকে!

জানতো, হৃদয় বড়ই স্পর্শকাতর, সাবধানে সোহাগ করো
পাহাড়ের চূড়ায় সতেজ মখমল ঘাসে শুইয়ে দিও
চারদিক থেকে যেনো আকাশের মতো দেখতে পায় অতৃপ্ততা;

তুমি হৃদয়ের যত্ন নিও প্রত্যহ বিকেলে
এখন থেকে বিকেলগুলো উজ্জ্বল করবে ‘ও’

জলের ভেতর মাছের মতোন

সাইফুল ইসলাম সাইফ

জলের ভেতর মাছের মতোন সাবলীল আমার দুঃখ
আমার হৃদয় মায়ের গর্ভের মতোন
সঙ্গমে আশা রাখি পুত্রের- কন্যা আসে
এই বড়ি সেই বড়ি কতো কী!
সব ভেস্তে যায়-
অসংখ্য দুঃখের জন্ম দেই

তেইশ বছর যে আমার পায়ে জল ঢালে, তার খবর রাখি না
দূরের একটি পঙক্তির জন্যে কাছের সুখ পায়ে ঠেলে
বোধের হাটে পঙক্তির পশরা করব বলে
চষে বেড়াই সারা দ্যাশ
সেমিনার, সমাবেশ, মিছিলে যাই
বোধের হাটের সন্ধান মিলে না আমার
জোচ্চর, চোর, দস্যুর দ্যাখা মেলে

ছুটে চলি কবিতা থেকে কবিতায়
বোধের চাবি খোয়া গেলে কবি আর থাকে না কবি
কবিতার নাম করে বসেছে দেখি
মুর্খের, ভণ্ডের, দালালের হাট

একাত্তরের বটতলা, তেরোর শাহবাগ
বোধের হাট-
এই হাটে আসে না আগামীর সওদা নিতে
প্রথার শিক্ষাঙ্গনের চালাক চতুর ছাত্ররা
হয় না আমার বোধের হাটে পঙক্তির পশরা
জলের ভেতর মাছের মতোন সাবলীল আমার দুঃখ

এই পৃথিবী

সামসুল ইসলাম

এই পৃথিবী তুমি কি পলিও খেয়েছে?
নিয়েছ কি হাম, যক্ষ্মা, কলেরা সবকটি টিকা?
নিশ্চয় নেওয়নি,
আসলে তুমিতো মানুষই না!
তোমার বুকের উপরে থাকা মানুষগুলো
এতো ময়লা ত্যাগ করে তাও তোমার কলেরা হয় না।
তোমার হৃদয় মাঝে আগুন,
তোমার বুকের বসবাসরত মানুষগুলোর

আগুনের ব্যবহার দেখলে
তুমি হয়তো একটু মানুষ হতে,
একবারে জ্বালিয়ে দিতে তোমার উপর বসবাসকরা আগুনহীন
রুগ্ন মানুষ গুলোর হার আর সেই ছাই দিয়ে
তোমার হৃদয় হয়তো একটু ঠাণ্ডা হতো।
তবে মানুষের বাচ্চাগুলোর এতেও মন ঠাণ্ডা হয় না।
তোমার বুকের উরব খোড়াখুড়ি করে,
তোমার একটু শুরশুরিও লাগে না?
তুমি মানুষই না!
তোমার একটু জায়গা দখল করার জন্য
কতো রূগ্ন মনুষের বাচ্চা তারা বলি দেয়
তুমি দেখতে পাও না...
এতো সব আগুনহীন বলি হওয়া রুগ্ন মানুষের বাচ্চাগুলোর
পরে থাকা রক্তগুলো তোমার বুকে উপর
গাজা, বার্মা, সিরিয়ায় লেগে থাকে
পচতে থাকে
তারপরেও কি তোমার হৃদয়ে ব্যাকটেরিয়া বাসা বাঁধে না?
এই পৃথিবী তুমি কি টিকা নিয়েছ?
তোমার কোনো রোগ হয় না?
তুমি কোনো মানুষের বাচ্চাই না।

সৈয়দ ওমর হাসান

নিয়তির সাথে

বাড়ির দেয়ালে নোনা ধরে গেছে

পলেস্তরা ফেলে দিয়ে দেখি
পুরনো ইটগুলো চুপচাপ শুয়ে আছে।
কখন যে কার সাথে দেখা হয়ে যায়!

জেগে উঠবার সাধ নিয়ে
কতো যে প্রহর গুনেছি

একদিন নিয়তির সাথে
দেখা হয়ে গেলো
তারপর বহুদূর থেকে দল বেঁধে
উড়ে গেছে বলাকারা।

বেমানান সব অতিথিরা এসে
বুনে দিয়ে গেছে আগাছার বীজ।

কীর্তনখোলা

সৈয়দ মেহেদী হাসান

ভোরের রোদ সাবধানে থেকো
দণ্ডপ্রাপ্ত কুয়াশার ভিড়ে রিপু করা স্রোত

এখানে একগুচ্ছ ঘর ছিলো-ভাঙ্গুলী জনপদ
অনেক ব্যর্থতায় ডুবেছে-বাড়ি ফেরেনি
দ্বিপদ মানুষের খুনসুটিতে শব্দেরা
ছত্রভঙ্গ হয়ে শুয়ে আছে হাটুর ভাঁজে;
রাত্রি শেষের পর বিচলিত দ্রোহে

চাপাতাদের প্রতিবাদ কেটলির ভেতর
নারীর মনের মতো লুট হয় ঘরবাড়ি-কিষাণীর ক্ষোভ
রাতের উজানে টোকা দিয়ে রেখে গেলো
অক্ষরহীন পল্লব
অতিপরিচিত অন্ধপার্লারে রূপের বয়ান
মাটির বিদ্রোহে ভাঙনকবলিত জীভ-
ইচ্ছামৃত্যুর কাছে পাণ্ডুলিপি দিয়ে
কাছে টেনে নিলাম তোর মুখ;
শেষাবধি এতো আগুন এতো বিধ্বস্ত শব্দচূর্ণ
এতো করুণার সাক্ষী তুই কীর্তনখোলা নদী...

খেলাঘরের কৃত্তিকা

স্নিগ্ধ নীলিমা

কৃত্তিকা আদিবাসী মেয়েটির নাম।
মেয়েটি কি হিজাবে ঢেকেছিলো ওর
দশ বছরের বাড়ন্ত লোভনীয় শরীর!
ফ্রোকের নিচে ওর উন্নত স্তন, নিতম্ব
ধর্ষকের চোখে ছড়ায় মোহনীয়তা!
সেদিন সেজেছিলো বুঝি প্রসাধনীতে
কারো হৃদয়ে মুগ্ধতা ছড়িয়ে দিতে!

বাবা মেলায় পুতুল কিনে দেয়নি বলে
সারারাত কেঁদেছে অভিমানী মেয়েটি।
মৃত্তিকার সাথে পুতুলবিয়ে খেলবে বলে
কতো শতো আয়োজন সাধের খেলাঘরে।
ওর ছোট্ট নয়নে পৃথিবীটা স্বপ্নীল ছবি,
আনন্দ, ভালোবাসায় ঘেরা বর্ণালী সবই।

শতো ধিক মানুষের আদলে ওই পশুকে
পৈশাচিক আনন্দে মেতেছিলো যে কীট
মায়ের পবিত্র গর্ভকে কলঙ্কিত না করে
কেনো ঔরসেই মৃত্যু হলো না নষ্ট ভ্রুণের।
কৃত্তিকার রক্তাক্ত যৌনাঙ্গে শক্ত কাঠ
আজ সারারাত আমাকে ঘুমুতে দেয়নি।

গাধা

হাসিবুল হাসান শারদ

আমার যখন বোধোদয় হলো
আমি শেকলকে মেনে নিলাম
আমি এই কারাবাসকে আনন্দঘন করে তুললাম
বুঝতে পারলাম আমি এক অর্বাচীন গাধামাত্র
প্রবীণ গাধাগণও যে দাসত্ব করেছেন
আমিও তা-ই করব, বেশি কিছু নয়।
আমার বোধোদয় হলো বিদ্রোহী গাধাদের জবেহ হতে দেখে
আমি ভীত হৃৎপিণ্ডে মহাপরাক্রমশালী
অদৃশ্য গাধাধিরাজের পদতলে

আত্মসমর্পণ করলাম।

দিকে দিকে হাততালি পড়ল আমার নতুন পরিচয়ে
আমি সেই থেকে বেশ ভালো এক ভারবাহী জীব
আমার বেশ সুনাম হয়েছে নির্বোধ হিসেবে
আমি এখন শান্তিতে কাজ করি, শান্তিতে ঘুমাই।
আর তুমি!
পারলে না তো আদর্শ গাধা হতে
তুমি উগ্র দ্রোহী রগচটা থেকে গেলে
একাকি লড়তে চাইলে সমস্ত গাধাত্বের বিরুদ্ধে
বুকে তোমার তাজা রক্তে মিশে
দুঃসাহসিকতার আধিক্য ছিলো
তুমি যুদ্ধ করলে
দেখলে না কীভাবে আমরা আত্মসমর্পণ করি
আমরা গাধারা তোমাকে উল্টো গাধা ভাবলাম
কেননা তুমি বধ হলে,
আমরা সুখে তাকিয়ে দেখলাম
তুমি আজ তীরবিদ্ধ এক মুমূর্ষু চেতনা
তুমি এক ক্রুশবিদ্ধ রক্তাক্ত গোঙানি
তুমি এক বিদগ্ধ সূর্য আগামী সকালে।

কবিজী

হুজাইফা রহমান

একজন ভাবের কবি
এবং একটি জ্বলন্ত সিগারেট...
ফাঁকা রাস্তার দিকে
উদাস কবির দৃষ্টিকোণ।
মাথার উপর ল্যাম্পপোস্ট
ঝুলে আছে নির্দ্বিধায়,
আলো বিলানোর অপেক্ষায়।
খোলা আকাশের বুকে

কবিজীর সিগারেটের ধোঁয়া
হয়তো মিশে যাচ্ছে মেঘেদের সাথে!
ওদিকে মাঝিবিহীন নৌকো
কীর্তনখোলায় কবির মতো
নিঃসঙ্গ সময় কাটাচ্ছে...!

আমাদের স্মরণকথা

রাসেল আহমেদ সেই জাদুনগরের ‘ফিল্ম স্কুল’ যেথা প্রাণ বাজি রাখা বোধেরা জন্মায়

ঈয়ন

১.

“সৃষ্টিশীল আত্মা’রা খসে যাচ্ছে, ঝরে যাচ্ছে, জীবন থেকে; সভ্যতা থেকে তাদের প্রাপ্য বুঝে নেবার আগেই। অন্তরালে অন্তরীণে হয়তো এমনটাই হয়, এমনটাই হবে; আত্মা যদি অবিনশ্বর হয়। আমরা জানি ঈয়ন, দৃশ্যমান ছেড়ে চলে যাওয়া আত্মারাজি আসলে আমাদের থেকে কখনোই দূরে চলে যায় না। তাদের না বলা কথাগুলো বলে যায় অবিরত, বাতাসের ফিসফিসানিতে, বৃষ্টির কান্নায়, দুঃসহ দমকে। আমাদের দায়বোধকে স্মরণ করিয়ে দিতে; স্মরণ করিয়ে দিতে, প্রতি মুহূর্তে।” প্রায় আট বছর আগের এক সকালে এই কথাগুলো বলছিলেন রাসেল ভাই, মানে প্রয়াত চলচ্চিত্র নির্মাতা রাসেল আহমেদ। আরো বলেছিলেন, “স্যালুট জানাই এসব অমূল্য আত্মাদের, যারা তথাকথিত বাস্তব জীবনকে সরাসরি উপেক্ষা করে এসেছেন কাজ আর দায়বোধের প্রেরণায়। আমাদের মনে রাখতে হবে তাদের না বলা কথাগুলো, না করা কাজগুলোর প্রতি আমাদেরও দায়, নেহাৎ কম নয়।”

মূলত আমাদের দুজনের পুরনো সহযোদ্ধা সাংবাদিক এসএম সোহাগের মৃত্যুর খবর শুনে তিনি এই কথাগুলো বলেছিলেন। চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান *থিম থিয়েটার উইজার্ড ভ্যালী*র প্রতিষ্ঠাতা এবং অসমাপ্ত চলচ্চিত্র নৃ-এর স্রষ্টা এই রাসেল। নিজের প্রথম চলচ্চিত্র সম্পর্কে এই স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতা বলতেন, "নৃ শুধু চলচ্চিত্র নয়, এটি একটি আন্দোলন।" নিজের জীবন দিয়েই তিনি এ কথার প্রমাণ দিয়ে গেলেন। বাংলাদেশি স্বাধীন চলচ্চিত্র আন্দোলনের এই মহান যোদ্ধার মৃত্যু আমায় স্মরণ করিয়ে দেয় শ্রদ্ধেয় জহির রায়হান, আলমগীর কবির বা তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনীরের অকাল প্রস্থান। যদিও নিখাদ চলচ্চিত্রের প্রেমে বা চাপে নিহত নির্মাতার সংখ্যা এ দেশ বা দুনিয়ায় কয়জন তা আমার জানা নেই।

গতো বছর বাবার মস্তিষ্কে আঘাত পাওয়ার খবরটা সম্ভবত সহযোদ্ধা চিত্রগ্রাহক ড্যানিয়েল ড্যানির কাছ থেকে শুনেছিলেন রাসেল ভাই, মানে প্রয়াত চলচ্চিত্র নির্মাতা রাসেল আহমেদ। আমার অসহায়ত্বটা তার চেয়ে আর কেই-বা ভালো বুঝেছিলো তখন। অথচ ভাইয়ার ক্রমবর্ধমান দেনার চাপের কথা মাথায় থাকায় তাকে কিছুই জানাতে চাইনি; তিনিও কিছু জানতে চাননি। ইতোপূর্বে বহুবার মুখ ফুটে বলার আগেই সমস্যা বুঝে নিয়ে যেভাবে সমাধান করেছেন, এবারো তাই করলেন। 'বিকাশ' অ্যাকাউন্টে দুই হাজার টাকা পাঠানোর পরো তার জিজ্ঞাসা ছিলো শুধু "পাইছিস?" এটুকুই। তখনো ভেতরবাক্স খুলে দেখিনি। তবে কথাযন্ত্রে তার 'কল' আসার সামান্য আগে একটি বার্তা আসার সংকেত পেয়েছিলাম। তাই আন্দাজ করেই বললাম, "ভাই পাইছি মনে হয়। তা'ও দেইখা জানাইতেছি।" সেদিন আসলে আরো টাকা যোগাড় করার তাড়ায় পরেও আর খুব বেশি কথা হয়নি তার সাথে। মূলত বাবার অসুস্থতার সংবাদে অস্থির ছিলাম।

২.

এরপরো অবশ্য একবার কথা হয়েছে আমাদের, মানে আমার আর রাসেল ভাইয়ের। সে গল্পে একটু পরে আসছি। বলছি ২০১৭ সালের এপ্রিলের কথা। *মুভিয়ানা ফিল্ম সোসাইটি*র মুখ্য সংগঠক বেলায়াত হোসেন মামুন এবং এক পরমাত্মীয়ের কাছ থেকে আরো বেশ কিছু টাকা যোগাড় করে ১৩ এপ্রিল সকালে বরিশালে পৌঁছাই। এরপর কয়েকটা দিন সব কর্ম-চিন্তা বাদ দিয়ে শুধু বাবাকে সময় দেই। সারাক্ষণ তার সাথে কাটাই। তার মুখ থেকে এমন সব পারিবারিক গল্প শুনি, যা আগে কখনো শোনা হয়নি। এরই মাঝে ১৭ এপ্রিল প্রয়াত দাদী সৈয়দুন্নেছা বেগমের ছোটবোন হাফিজা বেগম লালন দেহত্যাগ করেন। তারা ছিলেন ঝালকাঠীর বারৈয়ারা গ্রামের রাজনীতিবিদ মীর মমতাজ উদ্দিন এবং তার ধর্মভীরু পত্নী সৈয়দা হাকিমুন্নেছা বেগমের কন্যা। লালন দাদুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যাদের কোনো সন্তানই আর দুনিয়ায় রইলেন না। বাবার মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি এড়াতে এই সংবাদ তার কাছে চেপে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যে কারণে পারিবারিকভাবে বাবার অনেক দায়িত্ব আমাকেই পালন করতে হয়। এমন সব দায়িত্ব, যা পালনের কথা আগে কখনো ঘুর্ণাক্ষরেও ভাবিনি। তখনো বুঝিনি নিয়মিত লাশ বহন, দাফন আর কুলখানি আয়োজনের বয়সে পৌঁছে গেছি আসলে। বাবা কিছুটা সুস্থ বোধ করায় ২১ এপ্রিল রাতে ঢাকা ফেরার সিদ্ধান্ত নেই। প্রচণ্ড ঝড়ের সেই রাতে বাসার কেউই যেতে দিতে চায়নি। কিন্তু কেনো জানি কারো কথা শুনলাম না!

রাত এগারোটায় নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনাল থেকে রওনা করা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসটি দৌলতিয়া ফেরি ঘাটে পৌঁছায় ঠিক আড়াইটায়। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ফেরি চলাচল কয়েক দফা বন্ধ থাকায় ঘাটে তখন বিশাল জট। চারটা পাঁচ নাগাদ বাসটি ফেরিতে পৌঁছায়। সাকুরা পরিবহনের বাস, ঢাকা-বরিশাল রুটে 'রাফ' ড্রাইভিংয়ের জন্য যারা কুখ্যাতির শীর্ষে। পদ্মা তখনো উত্তাল। ঢেউয়ের তালে তালে সামনে-পিছনে আসছে বাসগুলো, দুলছে পুরো ফেরি। মৃদু ঘুমের ঘোরে আমাদের বাসের সব যাত্রীও তখন দুলছে। এমন সময়ে গল্পের নায়ক হিসেবে আবির্ভাব আলী হায়দারের। আমাদের চালকের সহকারীই শুরু করেন তার উপাখ্যান। একই কোম্পানির এই চালকের সাথে তিনি চারটি 'ট্রিপ' মেরেছেন, চার দফা ঢাকা-বরিশাল আসা-যাওয়ায় তার সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। তার মতে, হায়দার মোটামুটি 'সুপারহিরো কোয়ালিটির ড্রাইভার'। তার বাসকে অন্য কোনো গাড়ি ওভারটেক করতে পারে না। বরং তার বাসই সামনের সবাইকে ছাড়িয়ে সবার আগে গন্তব্যে পৌঁছায়। সহকারীর সাথে চালকও যোগ করেন, "হায়দার যে গাড়িডা চালায়, হেইডাও অনেক ভালো। আমিও ওইডা লইয়া দুইডা ট্রিপ মারছি। তহন আমারেও কেউ ওভারটেক করতে পারে নাই।" আমার সিট নম্বর ছিল 'বি-টু', ড্রাইভারের থেকে বড়জোর চার ফিট দূরত্বে। তাই বেশ স্পষ্টই শোনা যাচ্ছিল এই আলাপ। আর আমিও কেনো জানি অযাচিত কৌতূহল নিয়ে বেশ মনোযোগ দিয়েই শুনছিলাম।

পাটুরিয়া ঘাটে ফেরি থেকে নামার পর আমাদের ড্রাইভারের ওপর সম্ভবত আলী হায়দারের ভূত সাওয়ার হয়। একের পর এক গাড়ি ওভারটেক করে তিনি যখন এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন একদম সামনের সিটে বসা এক যাত্রী বলেন, "ভাই, সবাই আলী হায়দার হতে চাইলে কিন্তু যাত্রীদের খবর আছে!" এর খানিকবাদই মোড় ঘোরার সময় একটা ট্রাককে ওভারটেক করতে গিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা দুটি ট্রাকের সামনে পরে বাসটি। দুর্ঘটনার আগে আমার কানে হেলপারের শেষ যে কথাটি ভেসে আসে, তা হচ্ছে "ওস্তাদ, দুইডা"! পরম দক্ষতায় মুহূর্তের মধ্যে ব্রেক কষে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়ানোর চেষ্টা করেন ড্রাইভার। উল্টে গিয়ে ডিগবাজি খায় বাসটি। চিরচির শব্দে ভেঙে যায় বাসের সামনের আর একপাশের সবগুলো জানালার কাঁচ। পাঁচ-সাত সেকেন্ডের মাথায় বাসটিকে সজোরে ধাক্কা মারে সামনের ট্রাকটি। ততোক্ষণে বাসের মধ্যে আতঙ্কে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে। বিশ সেকেন্ডের মধ্যে সব স্থির হয়ে যায়। তারো বেশ কিছুক্ষণ পর সবাই বুঝতে পারে বাসটি মহাসড়কের ওপরেই আছে; পাশের খাদে পরে যায়নি। ড্রাইভার-হেলপার ততোক্ষণে হাওয়া। যাত্রীরা একজন আরেকজনের গায়ের ওপরে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। আতঙ্কে চিৎকার করছেন অনেকে। কেউ কেউ কথাযন্ত্রে থাকা টর্চ লাইট জ্বালিয়ে সিটের নিচে আটকে যাওয়া সহযাত্রীকে উদ্ধার করছেন। কেউ বিলাপ করতে করতে নিজের ব্যাগ খুঁজছেন। চল্লিশ সেকেন্ডের মাথায় বাসের ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয় কেউ একজন।

৩.

রাস্তার দু'পাশে ততোক্ষণে জ্যাম তৈরি হয়ে গেছে। বেশ কয়েকজন উদ্ধারকারী এসে যাত্রীদের দ্রুত বেড়িয়ে আসতে বলছেন। অবশেষে বের হয়ে উল্টে থাকা বাস থেকে অন্যান্যদের বের হওয়ার ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক-এ আপলোড করে লিখি "বহু কাজ বাকি/ তাই বেঁচে থাকি"। দুর্ঘটনাস্থল থেকে মিরপুরে বাসায় ফেরার আগেই কথাযন্ত্রে ফের রাসেল ভাইয়ের ডাক। কণ্ঠ শুনে বুঝলাম, তিনি ঘুম থেকে উঠেই আমার ছবি দেখে বেশ উদ্বিগ্ন। জানালাম, তেমন কিছু হয়নি। তবুও তিনি ঠিক আশ্বস্ত হলেন বলে মনে হলো না। জীবনে প্রথমবারের মতো মহাসড়কে দুর্ঘটনা কবলিত হওয়ার অভিজ্ঞতা দেয়া সেই ২২ এপ্রিল সকালের কথোপকথনই যে আমাদের জীবনের শেষ বাতচিৎ হবে তা মহাপ্রকৃতি তখনো নিশ্চয় জানতেন। ভাইয়ার শেষ কথা ছিলো "আইয়া পড়িস, আইয়া পড়িস, আইয়া পড়িস।" বাড্ডা এলাকায় ভাড়া নেয়া নতুন বাসায় দাওয়াত দিতে গিয়ে তিনি এভাবেই বলেছিলেন। জবাবে আমি শুধু বলেছিলাম "হ, ভাই"! এরপর গিয়েছিলামও সেই বাসায়। যার প্রতিটি কক্ষ ও সামগ্রীতে ছিলো রাসেল ভাইয়ের সৌরভ। আহা, নিখাদ মানুষের গন্ধ।

বাস দুর্ঘটনার ঠিক আট দিনের মাথায় পহেলা মে রাতে আরো এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। সেদিনও ঝড়ের রাত, সন্ধ্যা থেকেই প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। এমন সময়ে ঢাকার জলাবদ্ধ রাজসড়কের খোলা ম্যানহোলে ডুব দিয়ে উঠে জানলাম, কিছুদিন আগে একই গর্তে এক শিশু নিখোঁজ হয়েছে। পরে যার লাশও পাওয়া যায়নি। সেদিন আবার বাবাকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেছেন ছোট চাচা। তাকে ঢাকাই ডাক্তার দেখানোর সব বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিলো। অথচ জলে ভিজে আমার মুঠোফোন তখন বন্ধ। পোশাকে তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা। বাসায় ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম, মহাফাঁড়া যাচ্ছে আসলে। না জানি নিকট ভবিষ্যতে আরো কতো কী দেখতে হয়। পরক্ষণে নিজেই নিজেকে সাহস দিতে বলেছিলাম, যা হবে সামলে নেয়া যাবে। অথচ শঙ্কা সত্য করে মাত্র দুই সপ্তাহের মাথায় যখন আরেক ঝড়ের রাত আমার মুখোমুখি, কোনোভাবেই নিজেকে সামলে নিতে পারিনি।

৪.

তামাম চিন্তা-ভাবনার ভিত কাঁপিয়ে দেয়া ২০১৭ সালের সেই ১৫ মে রাতে খুব চেষ্টা করেও কোনোভাবেই শক্ত রাখতে পারিনি নিজেকে। বারবার ভেঙে পড়ছিলাম, আদতে তখন ভাঙছিলো অজস্র যৌথস্বপ্ন, আশা-প্রত্যাশা। এরচেয়ে ভারী কোনো সময় বেয়ে ঢাকা থেকে বরিশাল যাইনি কখনো। জীবনসম গ্লানি, হতাশা আর শোকের ভারে পুরোটা পথ শুধু ভেবেছি শেষ সাত বছরে কতোবার এই পথ একইসঙ্গে পাড়ি দিয়েছি আমি আর রাসেল ভাই। একদিন তার নিথর দেহ নিয়ে ফেরার জন্যও যে আমিই মনোনীত হবো, তা কি কখনো ঘুণাক্ষরেও ভেবেছিলাম! রাস্তায় ঝাঁকুনিতে কফিনটা আচমকা নড়ে উঠলেও ভাবছিলাম, ভাই জেগে উঠলেন নাকি। কিন্তু নাহ, সে আশায় গুঁড়েবালি। তিনি উঠলেন না। তবুও ভাবছিলাম, তিনি জেগে উঠে নিজেকে কফিনের মধ্যে কর্পুর আর চাপাতায় ঢাকায় কফিনে মোড়ানো দেখলে কি ভয় পাবেন? সম্ভবত না। কারণ তার কোনো ভয় ছিলো না। বরং

শতো মনে সাহস জাগানিয়া প্রাণ ছিলো তার। এসব ভাবতে ভাবতেই রাসেল ভাইয়ের প্রিয় চন্দ্রদ্বীপের পথে এগিয়ে চলছি আমরা। মাঝরাত পেরুনোর পরো ঝড়-বৃষ্টি থামছেই না।

৫.

আদি চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চলে বরিশাল শহর জন্মের ইতিহাসটা খুব বেশিদিনের নয়। এর বয়স মাত্র ২১৮ বছর। বাকেরগঞ্জ সংলগ্ন নদীতে চরপড়ার কারণে ১৮০১ সালে এই স্থানে জেলা সদর স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয় তৎকালীন ব্রিটিশ প্রশাসন। তারো ত্রিশ বছর পর ১৮৩১ সালে রামকানাই রায় নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে বরিশাল মৌজার সব জমি কিনে নেয় সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৬৯ সালে বরিশাল টাউন কমিটি, পরে ১৮৮৫ সালে মিউনিসিপ্যালটি বোর্ড প্রবর্তিত হয়। দেড়শ বছর আগেও প্রথাগত শিক্ষায় বেশ পশ্চাৎপদ ছিলো নদী-খাল বেষ্টিত এ-শহরের ছেলেমেয়েরা। ইংরেজরা ১৮৫৪ সালে জিলা স্কুল প্রতিষ্ঠার পর বরিশাল অঞ্চলে কলোনিয়াল শিক্ষার জাগরণ শুরু হয়। এর তিন দশক পর ১৮৮৪ সালে স্বদেশী চেতনার ধারক দানবীর মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত তার পিতা ব্রজমোহন দত্তের নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তবে ব্রজমোহন নয়, বিএম স্কুল নামেই পরিচিত পায় কালীবাড়ি রোডের এ-স্কুলটি। তখনো প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করার পর বরিশালে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের আর সুযোগ ছিলো না। যে কারণে পরে তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বাবু রমেশ চন্দ্র দত্তের অনুরোধে ১৮৮৯ সালের ১৪ জুন ওই স্কুল কম্পাউন্ডেই বিএম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন মহাত্মা অশ্বিনী দত্ত। 'সত্য-প্রেম-পবিত্রতা' আদর্শ নিয়ে পথ চলা শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি। বিএম স্কুল কম্পাউন্ড থেকে ১৯১৭ সালে কলেজ রোডের বর্তমান ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করা হয় বিএম কলেজ। প্রায় ৬২.০২ একর জায়গার ওপর গড়ে ওঠা এই নিজস্ব ক্যাম্পাসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে যে আবাসিক এলাকা, তার বয়স আজ ঠিক ১০১ বছর। গতো বছর জন্মশতবর্ষে দাঁড়িয়ে নিজের অন্যতম এক গুণী সন্তানের অভিমানী প্রস্থান দেখেছে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই পাড়া। যাকে 'শ্রেষ্ঠতম' লিখেও ফের মুছে ফেললাম। কারণ, শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাই তিনি সহ্য করতে পারতেন না। প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন প্রতিযোগিতা। বলতেন, "হে মানুষ মানবজন্মই তোমার বড় সার্থকতা। যদি শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণ করতে চাও, প্রমাণ করো তোমার মানবিকতার।"

জায়গাটির নাম কলেজ পাড়া। বরিশাল মহানগরীর শহরের বৃহৎ এলাকাগুলোর একটি। যার পশ্চিমে নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনাল, সিএন্ডবি রোড, পূর্বে নতুনবাজার, উত্তরে জেল খাল এবং দক্ষিণে গোরস্থান রোড। মধ্যে অজস্র গলি আর মহল্লা। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, বিপ্লবী চিত্তরঞ্জন, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, মুকুন্দ দাস, শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, ফজলুল কাদের চৌধুরী, কবি জীবনানন্দ দাশ, আবুল হাসান, হুমায়ূন কবির, সিরাজ শিকদার, বিডি হাবিবুল্লাহসহ অসংখ্য গুণীজনের স্মৃতিবিজড়িত এ-পাড়ায় শিক্ষিত মানুষের হার শুরু থেকেই একটু বেশি। যে কারণে চিন্তা-চেতনায়ও সব সময় অগ্রগামী ছিলো এলাকাটি। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬'র ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, ৭১'র মহান মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিএম কলেজের শিক্ষক-কর্মকতা-কর্মচারী-শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি কলেজ পাড়ার সচেতন বাসিন্দারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সামাজিক কর্মকাণ্ড, খেলাধুলা ও সাংগঠনিকচর্চার জন্য দুটি খেলাঘর ও দুটি ক্লাব ছিলো এখানে। মাত্র দুই দশক আগেও পুরো পাড়াই হয়ে ছিলো এক বৃহৎ পরিবার। যার রেশ আজো পুরোপুরি কেটে যায়নি হয়তো। এখানেই বেড়ে উঠেছেন স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাণ আন্দোলনের মহান যোদ্ধা রাসেল আহমেদ। যিনি বিশ্বাস করতেন, প্রতিটি মানুষই একে অপরের আত্মার আত্মীয়। মরহুম মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান ও সৈয়দ সখিনা বেগমের এই কনিষ্ঠ সন্তান ১৯৭৬ সালের ৫ জুলাই কলেজ পাড়াতেই জন্ম নেন। পারিবারিক কাঠের ব্যবসার কারণে তার কৈশোরে পাওয়া বিশেষণ ছিলো 'স'মিল'; অর্থাৎ বন্ধুগোত্রীদের কাছে তিনি 'স'মিল রাসেল' নামে পরিচিত ছিলেন। ব্যবসায়ী পিতার আহ্লাদ আর শিল্পনুরাগী মায়ের পরম মমতায় বড় হওয়া কর্কট রাশির এই জাতক একদিন বলেছিলেন, ব্যাপ্টিশ মিশন আর জিলা স্কুল বাদে বরিশালের প্রায় সবগুলো স্কুলেই তিনি পড়েছেন।

একই এলাকায় বেড়ে ওঠার কারণে শৈশব থেকেই চিনতাম রাসেল ভাইকে। তিনি ছিলেন আমার ছোট চাচার বন্ধু। তবু কেনো জানি তাকে 'ভাই' সম্বোধন করেছি আশৈশব। আমার বাল্যবন্ধু কাজী মোসলেহউদ্দিন সোহাগের বড় বোনের রুমে তার আঁকা একটি স্কেচ দেখে অবাক হয়েছিলাম সেই কবে। পরে যখন তাকে আবার ব্যান্ডদল *এরিডোনাস*-এর লিড ভোকাল হিসেবে দেখি, আরেক দফা বিস্মিত হই। আসলে আমি স্কুলে পড়ার সময় থেকে দেখেছি, গুণী ছেলে হিসেবে নিজস্ব বন্ধুমহলে বেশ কদর রাসেল ভাইয়ের। তবে দিন যতো গিয়েছে, বিস্ময়ের মাত্রা ততোই বেড়েছে। বিভিন্ন সময়ে তিনি নতুন নতুন রূপে হাজির হয়ে চমকে দিয়েছেন। তবে মানুষটির সাথে আমার আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছে অনেক পরে। এর মূল কারণ, তার চুপচাপ স্বভাব।

একটা সময় পর্যন্ত, খেয়াল করে দেখলাম, মূলত সিনেমা তৈরি শুরুর আগে অবধি তিনি খুবই কম কথা বলতেন। সেই রাসেল ভাই কিনা এক সময় একটি আস্ত 'ফিল্ম স্কুল' হয়ে উঠলেন!

৬.

প্রগতিশীল মুসলিম পরিবারের সন্তান হিসাবে রাসেল ভাই তার শৈশব-কৈশোরে অনুশাসনের পাশাপাশি পেয়েছেন এক সুস্থ সাংস্কৃতিক বলয়। বই পড়া আর আঁকাআঁকির অভ্যাস হয়েছে তখনই। মায়ের কাছ থেকে ছবি আঁকা শিখেছিলেন রাসেল আহমেদ। ছোটদের সংগঠন *আগুয়ান খেলাঘর* করতে গিয়ে তার পরিচয় হয় মঞ্চনাটকের সাথে। কৈশোর কেটেছে ব্যান্ড মিউজিক, স্টেজ শো আর সাহিত্য পত্রিকা করে। তারুণ্যে এসব চর্চা অব্যাহত রেখেই মেতেছেন ক্যামেরা-কম্পিউটার নিয়ে। ফটোগ্রাফি-ভিডিওগ্রাফির পাশাপাশি আর্টওয়ার্ক, এডিটিং, গ্রাফিক্স ও এনিমেশন চর্চা করেছেন, করিয়েছেন। এরই ফাঁকে দৈনিক পত্রিকায় শিল্প-নির্দেশক ও সাংবাদিক হিসাবেও কাজ করেছেন। সংগঠক আর আয়োজকের ভূমিকায়ও তাকে দেখা গেছে বহুবার। লিটলম্যাগসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমৃত্যু লিখে গেছেন, করেছেন বিভিন্ন প্রকাশনার প্রচ্ছদ ও অলংকরণের কাজ। ক্লাবের যেকোনো টুকরো কাজ থেকে শুরু করে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল আয়োজন সব জায়গাতেই নিজেকে সবচেয়ে কাজের মানুষ হিসাবে প্রমাণই স্বভাব ছিলো তার। এসব করতে করতেই কখন যে চলচ্চিত্র নির্মাণের ভূতটা রাসেলের মাথায় চেপে বসেছে, তা কেউ জানতেও পারেনি। বরিশালে বসেই তিনি নিভৃতে অডিও-ভিজুয়াল কাজের উপযোগী একটি দল গড়ে তুলতে শুরু করেন। চলচ্চিত্র চর্চার হাত ধরে যাত্রা শুরু করে *থিম থিয়েটার উইজার্ড ভ্যালী*।

সময়টা সম্ভবত ২০০৩/০৪। আমার আরেক অভিমানী প্রয়াত বন্ধু মার্সেল অনুপ গুদাসহ কয়েকজনকে নিয়ে একটা ব্যান্ড গঠন করে একের পর এক নতুন গান তৈরি করে চলেছি তখন। তবে নিজেদের 'প্রাকটিস প্যাড' নেই। অনুপদের হাসপাতাল রোডের বাসার গোডাউন বা অন্যদের 'প্যাড' ভাড়া নিয়ে প্র্যাকটিস করি। একই সময়ে ব্যক্তি কলহের জেরে *এরিডোনাস* ভেঙে যায়। দল থেকে বেরিয়ে যান রাসেল ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্যান্ডের লিড গিটারিস্ট সুদেব মণ্ডলসহ কয়েকজন। তখন ড্রামার নাসির ভাই (মোঃ নাসির) একদিন আমাকে আর অনুপকে রাসেল ভাইয়ের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাদের বললেন, "তোরা আমাদের সাথে চলে আয়, মানে এরিডোনাস-এ জয়েন কর।" তখন রাসেল ভাই আর নাসির ভাই ছাড়াও তখন ব্যান্ডে ছিলেন বেইজিস্ট রোমেল ভাই (আহসান উদ্দিন রোমেল)। নিজস্ব প্র্যাকটিস রুম পাওয়ার আনন্দে আমরা মহোৎসাহে যোগ দিলাম তাদের সাথে। তারো আগে এই *এরিডোনাস*-এর সাথেই প্রথম মঞ্চে উঠেছিলাম। তখন আমার ব্যান্ডের নাম ছিলো *এ্যাম*, মানে *এ্যাবসট্রাক মিউজ*। তখন অবশ্য সাথে অনুপ ছিলো না। নিজেদের গানও ছিলো না কোনো। গিটারিস্ট ছিলো আরেক বাল্যবন্ধু হিমেল রায়, বেইজিস্ট ছিলো জর্জ (ডিজে), আর ড্রামার মিলন। বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য করা সেই অনুষ্ঠানটির শিরোনাম ছিলো 'বাঁচাও বিধাতা'। আইয়ূব বাচ্চুর এই গানটি সেদিন কভার করেছিলেন রাসেল ভাই আর আশিষ'দা (আশিষ দে)। তখন অবশ্য রাসেল ভাইয়ের চেয়ে সুবেদ'দার সাথেই ঘনিষ্ঠতা বেশি ছিলো আমার। তিনি আবার আমার *জাগৃতি খেলাঘর*-এর বড়ভাই ছিলেন। সম্ভবত তার বন্ধু হিসেবেই প্রথম রাসেল ভাইকে চিনেছিলাম। পরে জানতে পারি, তারা দুজনেই আমার ছোট চাচারও বন্ধু। রাসেল ভাই আর সুদেব'দা মিলে কলেজ রোডে ক্যাকটাস নামের একটি সাইবার ক্যাফের ব্যবসাও শুরু করেছিলেন। পরে রাসেল ভাই তার সমবয়সী ভাগ্নে রুবেলকে সাথে নিয়ে ঘেরের ব্যবসা শুরু করেছিলেন। পটুয়াখালীর একটি নদী লিজ নিয়ে শুরু করেছিলেন এই ব্যবসা। সেই সময়ে খুব কম সময়ের জন্য তাকে শহরে পাওয়া যেতো। অধিকাংশ সময় ঘেরেই কাটাতেন। শুনেছি সেখানে তিনি এক রাজকীয় বজরা তৈরি করেছিলেন। মাঝনদীতে গিয়ে হাল তুলে দিয়ে সেটাতেই রাত কাটাতেন। মোটরসাইকেল ছিলো তার সবচেয়ে প্রিয় বাহন। সেই সময়ে তিনি খুব দ্রুত মডেল বদলাতেন। পরে জেনেছি 'হাইসাঙের এক্স-সেল' তার সবচেয়ে প্রিয় বাইক।

৭.

সময়টা ২০০৫-০৬ সাল। আমি যখন সাংবাদিকতা নিয়ে মহাব্যস্ত, একদিন খুব সকালে রাসেল ভাই আমার বাসায় এসে হাজির। ঠিক তার আগের দিন ঘটনাক্রমে তিনি আমার 'ইয়াসিকা থ্রিটুওয়ানজিরো' মডেলের ডিজিটাল ক্যামেরাটি দেখেছিলেন। সেই সূত্রে এসেই বললেন, "তোর ক্যামেরাটা একটু দিতে পারবি?" যেকোনো মুহূর্তে লাগতে পারে বলে প্রথমে এড়ানোর চেষ্টা করতেই তিনি জানালেন, সন্ধ্যায় ভাগ্নির জন্মদিনের ছবি তুলে দিয়ে যাবেন। আর কোনো অজুহাত না দেখিয়ে কেনো জানি দিয়ে দিলাম ক্যামেরাটা। বললাম, রাতে অনেক দেরি করে ফিরি। তাই কাল সকালে দিয়ে গেলেই হবে। পরদিন তিনি একই সময়ে

এলেন। ডেকে ঘুম থেকে তুলে আমায় বিএম কলেজের মধ্যে নিয়ে গেলেন। আমরা পূর্ব গেট দিয়ে ঢুকে বাম দিকের পুকুর সংলগ্ন আদি ব্যায়ামাগারের পাশের পুরানো পিচের ট্যাঙ্কির ওপরে গিয়ে বসলাম। তখন শীতের দিন। ভাইয়া জ্যাকেটের পকেট থেকে আমার ক্যামেরাটা বের করে ফেরত দিলেন। এরপর অন্য পকেট থেকে আরেকটা ডিজিটাল ক্যামেরা বের করে বললেন, "এইটা আমার ভাগ্নি ইতালি থেকে পাঠাইছে। তুই চাইলে নিয়া কয়দিন ইউজ করতে পারস।" ততোক্ষণে ক্যামেরাটা আমি হাতে নিয়ে দেখে ফেলেছি, ওটা 'সনি সাইবার শট' সিরিজের ফাইভ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। আমার ইয়াসিকা ছিলো মাত্র থ্রি পয়েন্ট টু মেগাপিক্সেল রেজুলেসনের। তাই তার এ প্রস্তাবে আমি আনন্দে আটখানা হয়ে যাই।

মূলত সেইদিন থেকেই রাসেল ভাই ও আমার আলোকচিত্র-বিষয়ক আন্তঃআলাপ শুরু হয়। আমাদের পরবর্তী ক্যামেরা ছিলো ক্যাসিও'র এক্সিম মডেলের আট মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। পরে অবশ্য এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে সদর রোডের এস রহমান মার্কেট থেকে ভিডিও ক্যামেরা ভাড়া এনেও নষ্ট করেছি আমরা। এখানে আসলে 'আমি'ই বলা উচিত। কারণ, সেবার মনসা-মঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্তের বাড়ি ভিডিও করার সময় ক্যামেরা আমার হাত থেকে পরেই নষ্ট হয়েছিলো। রাসেল ভাই অবশ্য পুরো দোষটা নিজের ঘাড়ে নিয়েছিলেন। তখন তার একটা ল্যাপটপ ছিলো, আইবিএম'র। ব্যক্তিগত কম্পিউটার বা ল্যাপটপ না থাকায় ওটায় ছিলো আমার ডিজিটাল ফটোগ্রাফির ব্যাকআপ আর্কাইভ। ছবি রাখতে প্রায়ই মাঝরাতে গিয়ে হাজির হতাম ভাইয়ের ডেরায়। এতে সবচেয়ে বিরক্ত হতেন ইথেল আপু। রাসেল ভাই যার নাম দিয়েছিলেন ইরা আহমেদ। এই অকাল বিধবা স্ত্রীর সাথে তখন ভাইয়ার প্রেমপর্ব চলছিলো। সারারাত ফোনে কথা বলতেন দুজনে। তাদের যৌথকাহিনিতে পরে আসছি। ওই সময়টায় আমি এলে ইথেল আপুর কাছ থেকে ছুটি নিতেন রাসেল ভাই। এরপর সারারাত বিএম কলেজের মধ্যে আড্ডা দিয়ে ভোরে নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালে গিয়ে ডিম-পরোটা খেয়ে যে যার বাসায় ফিরতাম। এই খাবারটা বেশ প্রিয় ছিলো ভাইয়ার। আসলে এটাই ছিলো তার প্রধান খাবার। কারণ, বাড়িতে থাকলেও তিনি মূলত তখন বাইরে খেতেন। কাকতালীয়ভাবে একই দশায় ছিলাম আমিও।

শৈশবে পাড়ায় *চিরহরিৎ* নামের একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে দেখেছি, যা মূলত ছিলো বিএম কলেজ ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক। যার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন ভাইয়ার বাল্যবন্ধু, ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও প্রকৌশলী এসএম পলাশ। যার সাথে ভাইয়ার সম্পর্কটা আমৃত্যু সুদৃঢ় ছিলো। তার কাছে পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া জমি বিক্রি করেই সিনেমার কাজ শুরু করেছিলেন রাসেল ভাই। এছাড়া যেকোনো বিপদে-আপদে তার ভরসার জায়গায় ছিলেন এই পলাশ। এমনকি বিয়েতে তার উকিল বাপও তিনি। সেই *চিরহরিৎ* পত্রিকার স্মরণে থেকে যাওয়ার কারণেই রাসেল ভাইকে দৈনিক পত্রিকায় জড়ানোর ফন্দি এঁটেছিলাম। তখনো আমি বরিশালে থাকি। স্থানীয় দৈনিকের পাশাপাশি *সাপ্তাহিক ২০০০* নামের একটি ঢাকাই ম্যাগাজিনে কাজ করি। শুরু থেকে এর প্রিন্টার্স লাইনে থাকা 'শিল্প নির্দেশক' পদটি আমার মধ্যে প্রশ্ন তৈরি করেছিলো। এই পদে তখন সেখানে কাজ করতেন কনক আদিত্য। মানে জলের গান, প্রাচ্যনাট বা দেশাল-এর কনক'দা। প্রথমবার সম্পাদকের মুখোমুখি হওয়ার পর আমার জিজ্ঞাসা ছিলো তাকে নিয়ে। মানে, পত্রিকায় এই শিল্প নির্দেশকের কাজটা আসলে কী? ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক গোলাম মর্তুজা প্রশ্ন শুনে একটু হাসলেন। এরপর খুব ঠাণ্ডা মাথায় বুঝিয়ে বললেন, তার সাথে কিছুটা যোগ করলেন সহ-সম্পাদক জব্বার হোসেন। তাদের কথা শুনে খেয়াল করে দেখি, তখন বরিশালের সবগুলো দৈনিক কোনো আর্টিস্ট বা শিল্প নির্দেশক ছাড়াই প্রকাশিত হচ্ছে। এরপর যখন একটি নতুন পত্রিকা প্রকাশের সাথে সংযুক্ত হই, তখন এই অভাব পূরণের বিষয়টি মাথায় আসে। একই সাথে চিন্তায় আসেন রাসেল আহমেদ। কারণ, ওই যে *চিরহরিৎ*। আমার পত্রিকার সম্পাদক প্রয়াত মীর মনিরুজ্জামান ও বার্তা সম্পাদক শাকিব বিপ্লবকেও রাজি করাতে পারলাম এ ব্যাপারে। তবে সবচেয়ে দুরূহ কাজ ছিলো রাসেল ভাইকে রাজি করানো। কারণ, তখন তিনি নিজের মাছের ব্যবসা গুটিয়ে বিএম কলেজের সামনের কমটেক কম্পিউটার সেন্টারের প্রশিক্ষক ও গ্রাফিক্স ডিজাইনার। তবে তার সবচেয়ে জনপ্রিয়তা ছিলো নির্ভুলভাবে ডিভি লটারির ফরম পূরণে। তার মাধ্যমে পাঠিয়ে অনেকে লটারি জেতায় বিষয়টি বেশ চাউড় ছিলো তখন। তাছাড়া তিনি তখন দিনরাত কমটেকে থাকার অন্যতম কারণ ছিলো, ওদের কম্পিউটারগুলোর কনফিগারেশন। ওইগুলোয় গ্রাফিক্সের কাজ করে খুবই মজা পেতেন রাসেল ভাই। এসব ছেড়ে তিনি পত্রিকায় কাজ করবেন কিনা, সেটাই ছিলো আমার দুশ্চিন্তা। কারণ, তখন পত্রিকা মানেই অনিশ্চয়তা। একমাস বেতন হবে তো দুই মাস নাই দশা। অবশেষে তাকে রাজি করাতে পেরেছিলাম। পরে সেই *দৈনিক সত্য সংবাদ* থেকে শুরু করে *দৈনিক বিপ্লবী বাংলাদেশ*, *দৈনিক বাংলার বনে* ও *আমাদের বরিশাল* ডটকমসহ বরিশালের অজস্র লিটলম্যাগ, ভাঁজপত্র ও কাব্যগ্রন্থের নামাঙ্কণ করার পাশাপাশি শিল্প নির্দেশক হিসাবেও তিনি কাজ করেছেন।

গতো দশক থেকে নিজ হাতে তিল তিল করে গড়তে থাকা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান *থিম থিয়েটার উইজার্ড ভ্যালী*র দাপ্তরিক প্রস্তাবনার সূচনায় রাসেল আহমেদ লিখেছেন "মহাকাল ও মহাবিশ্ব এক মহাযাদুতে আক্রান্ত। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি কণার মাঝে লুকিয়ে আছে অসীম রহস্যজাল, আবিষ্কার, সম্ভাবনা, প্রয়োগ ও উৎকর্ষতা। মূলত প্রকৃতিলব্ধ প্রতিটি ক্ষুদ্রতম কণা বিশ্লেষণ দ্বারাই মানবসভ্যতার চলমান পদযাত্রা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় 'ছোট ছোট বালু কণা/ বিন্দু বিন্দু জল/ গড়ে তোলে মহাদেশ/ সাগর অতল'। ক্ষুদ্রতার সম্মিলনেই বিশালতার প্রকাশ; মূলত এই চিন্তা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই মানুষ ঘটিয়ে যাচ্ছে মিরাকল। একের পর এক বেরিয়ে আসছে সৃষ্টিজগতের অজানা সব বিষয়বস্তু। সৃষ্টির অপার যাদুতে বাকরুদ্ধ, বুদ্ধিমান ও কল্যাণমুখী মানবাত্মা ঝাঁপ দেয় সৃষ্টিশীল মগ্নতায়। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন যুগেই নিমগ্ন ছিলেন সেই সব যাদুকরগণ। আর তাই ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণে বিশেষায়িত তাঁরা। সাধারণের কারিগর, আমাদের যাদুকর। সভ্যতার মোড়ে মোড়ে এই যাদুকরদেরই মাইলস্টোন গাঁথা। স্বপ্নের পৃথিবীর যে উৎকর্ষিত রূপ আমাদের প্রতিনিয়ত প্রলুব্ধ করে, যাদুকররা সেই স্বপ্নের কারিগর হবার স্বপ্নে বিভোর।"

৮.

মা, মাটি ও মানুষে মাখামাখি হওয়ার গল্প নিয়ে রচিত *নৃ* চলচ্চিত্রের কারিগর রাসেল। টিজার/ট্রেইলর প্রকাশের কারণে ২০১৪ সাল থেকেই বহুল আলোচনায় আসা এই সিনেমাটি যখন সম্পাদনার টেবিলে মুক্তির শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিচ্ছে, ঠিক তখনই (১৫ মে ২০১৭) তিনি দুনিয়া ছাড়লেন। প্রচণ্ড ঝড়ের সেই রাতে যখন বরিশালে রওনা করে তার নিথর দেহ; হয়তো সহযাত্রী ছিলেন তার অশরীরী সত্তাও। পরদিন সকালে পৌঁছে যান প্রিয় কলেজ পাড়ায়। বন্ধু-স্বজনরা অপেক্ষায় ছিলো তার। কফিনটি যখন অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামানো হচ্ছে, তখন ভাইয়ার বাল্যবন্ধু শাহীন কাকা (রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী শাহীন) আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন। দেখি, উপস্থিত সকলের চোখেই তখন পানি। কেউ কেউ নিজেকে ঠেকাতে না পেরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠছেন। সেদিন দুপুরেই নগরীর মুসলিম গোরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। সেদিন পিতার কবরের মৃত্তিকায় মিশে যাওয়ার অপেক্ষায় শুইয়ে রেখে এসেছিলাম এক মাটির সন্তানকে। লিখে রেখে এসেছিলাম 'ঘুমাও রাসেল আহমেদ, জাগুক স্বপ্নেরা তোমার।' মৃত্যুর কিছুদিন আগে নিজের পয়সায় তিনি ওই কবরটি বাঁধাই করে টাইলস লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কয়েক মাস পর বরিশালে গিয়ে দেখি, তার কবরের ওপরে এক বুনোফুলের গাছ জন্মেছে। তাতে একটি মাত্র হলুদ রঙের ফুল। মৃদু বাতাসে দুলছে। আমার মনে হচ্ছিল, ফুলটা হেসে হেসে কতো কী বলছে!

রাসেল আহমেদ যখন বাসা খোঁজার জন্য ২০০৯ সালে প্রথম ঢাকায় আসেন, তখন আমি শান্তিবাগ এলাকায় একটা টিনশেড বাসা ভাড়া নিয়ে একাই থাকি। আমার তখনকার অফিস ছিলো মগবাজার। যে কারণে এর আশেপাশেই থাকতে চাইতাম। কিন্তু ঘুরেফিরে রাসেল ভাইয়ের ওই এলাকাটি খুব একটা পছন্দ হয়নি। একে ওই এলাকায় বাসা ভাড়া বেশি, তাছাড়া তিনি একটু কোলাহলমুক্ত এলাকায় ঘাঁটি গাড়তে চেয়েছিলেন। অবশেষে মোহম্মদপুর শেখেরটেক এলাকাটি তার পছন্দ হলো। বরিশাল ছেড়ে ২০১০ সালের শুরুতে তিনি পুরোপুরি ঢাকায় এসে পড়েন। সরকারি নিবন্ধনসহ সামগ্রিক কাগজপত্র তৈরি করে আনুষ্ঠানিকভাবে দাপ্তরিক কর্ম শুরু করে দেয়, চলচ্চিত্র নির্মাণকারী সংস্থা *থিম থিয়েটার উইজার্ড ভ্যালী*। তৈরি হয় একখণ্ডের নাটক *ফ্লাই-ওভার*। *দেশ টিভি*তে প্রচারিত এ নাটকটি প্রচুর প্রশংসা-আলোচনা-সমালোচনা কুড়ালেও তিনি আর তখন টিভি নাটক নির্মাণে উদ্বুদ্ধ হননি। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র ভাষায় দেশের অন্তর্ভুক্তিকরণকল্পে শুদ্ধ চলচ্চিত্র চর্চায় শিল্পের নন্দনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে নিজেকে এবং নিজের টিমকে ধীরে ধীরে চলচ্চিত্রের জন্য প্রস্তুত করতে শুরু করেন। চলচ্চিত্র পাঠ, শিক্ষা ও চর্চার সাথে সাথে ক্যামেরা, রিগস, লাইটস, সাউন্ড ও এডিট প্যানেল সমৃদ্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি কারিগরি ইউনিট তৈরি করেন।

চর্চার ক্ষেত্রে *উইজার্ড ভ্যালী* শিল্প শুদ্ধতার মানে বিশ্বাসী; এমনটা দাবি করে রাসেল বলতেন "আমরা চাই চলচ্চিত্রে শিক্ষিত ও দক্ষ পেশাদার কর্মী তৈরি হোক। সে কারণে শিল্প বা সাহিত্যের নন্দনে অবগাহনই মূল কথা নয়। চলচ্চিত্রে নন্দনকে যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে কারিগরি মাধ্যমের ভেতর দিয়েই যেতে হয়। কারিগরি দক্ষতা বাড়িয়ে সৃজনশীল শিল্প-সাহিত্য ও মেধার গাঁথুনিতে আমাদের সিনেমা একদিন পৃথিবী শাসন করবে। এমন আকাঙ্ক্ষা আমাদেরও।" অবশেষে ২০১২ সালের আগস্টে রাসেল পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *নৃ*'র কাজে হাত দেন এবং এভাবেই চলচ্চিত্র অঙ্গনে পা রাখেন। অডিও-ভিজুয়ালের খেলাটা আরো ভালো করে আত্মস্থ করতে একই বছরের জুনে আমিও সাংবাদিকতা ছেড়ে দেই। জুলাই থেকেই আমরা একসাথে থাকা শুরু করি। এরপর সাড়ে চার বছর আমরা একসাথে ছিলাম, মানে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর অবধি। এর আগেও আসলে বহু দিন-রাত

আমরা একসাথে কাটিয়েছি স্রেফ আলাপের জন্য। জীবনে তার সাথে যতো কথা বলেছি, একমাত্র প্রেমিকা ছাড়া আর কেউই আমার অতো কথা শোনেনি। একইভাবে তিনিও কম বলেননি। যার কিছু স্মৃতিতে রয়ে গেছে, কিছু মেইল, ম্যাসেঞ্জার ও ফোনের রেকর্ডে। প্রায়ই পড়ি বা শুনি। মাঝে মাঝে দেখিও। কত-শত 'স্টিল আর ভিডিও' আমাদের সময়ের সাক্ষী হয়ে এখনো টিকে আছে এই নশ্বর পৃথিবীতে।

আসলে রাসেল ভাইকে নিয়ে খুব সুশৃঙ্খলভাবে বলার ক্ষমতা আমার এখনো হয়নি। কখনো হবে বলেও মনে হয় না। তথাপি স্মরণে আসে কতো কিছু! মাত্র দুই বছর আগে, ২০১৬ সালের অক্টোবরে তিনি ফেসবুকে লিখেছিলেন, "জগৎজুড়ে এতসব দিবসের ফাঁকফোকড় গলে বছরব্যাপি ক্রমশ শোকদিবসের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এই হতভাগা জাতির। আর কত শোকদিবস চাই???" অথচ পরবর্তী অক্টোবর আসার আগে তিনিই নতুন এক শোকদিবস উপহার দিয়ে গেলেন! তিনি আমার ভাই, বন্ধু, শিক্ষক, সহযোদ্ধা কখনো কখনো পিতৃসম যত্নে আগলে রেখেছেন। শৈশবের খেলাঘর বা কৈশোরের ব্যান্ড জীবন থেকে শুরু করে পত্রিকা, নাটক, সিনেমা। আহা! জীবনের কতগুলো পর্বে এমন এক মানুষের সাহচর্য পেয়েছি, যিনি বলতেন "আমরা জানি সময় কখনোই পেরোয় না মানুষকে তার মানবতার সঠিক বোধে দাঁড় করিয়ে দেবার। মানুষকে মানুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার। যে মানুষটাকে নিজের অজান্তেই সে খুঁজে চলে নিরন্তর। আসুন সেই সত্যিকারের মানুষটাকে খুঁজে বার করি, উদ্ধার করে আনি নিজের ভেতর থেকে। আর শান্ত করি সময়কে।"

এমন ভাবনা থেকেই মূলত *নৃ* সিনেমার জন্ম। লোকেশনে বসে বসেই গল্প বুনেছেন তিনি। সিনেমাটি চিত্রায়ণের কাজ শুরু হয়েছিলো ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এবং তা শেষ হয় ২০১৫ সালের একই মাসে। তিন বছরে প্রায় ৯০ দিন শুটিং হয়েছে। বরিশালের কমপক্ষে ২৫টি স্থানে কাজ হয়। আমাদের প্রথম দৃশ্যকে ধারণ করতে তিনদিন লেগেছিলো। আরো স্পেসিফিকভাবে বললে প্রথম শটটি ওকে হয়েছিলো আড়াই দিনের মাথায়। তখনই আমরা বুঝেছিলাম, এই সিনেমা শেষ করতে আমাদের বহু হ্যাঁপা পাড়ি দিতে হবে। তবু আমরা গান গাইতাম, 'আমরা হারব না হারব না, এই সিনেমার একটি শটও ছাড়ব না।' আসলে চিত্রনাট্যে রাসেল একের পর এক দৃশ্য গেঁথে যেভাবে গল্পটা সাজিয়ে ছিলেন, সেটি পড়ে সামান্য ছাড় দিতে ইচ্ছে করছিলো না আমাদের। তবুও পরে বহু ছাড় দিতে হয়েছে। মূলত অর্থাভাবে।

৯.

রাসেল ভাইয়ের সাথে যে জায়গায় আমি আসলে ঐক্যমতে পৌঁছেছিলাম, তা মূলত আমাদের চিন্তা ও কর্ম। বরিশালে একত্রে দিনযাপনকালেই আমরা বিশ্বাস করতাম, একদিন আমরা কেউ না থাকলেও এখন করে যাওয়া কাজগুলোই আমাদের কথা বলবে। সিনেমাটি করতে গিয়ে দুই বেলা 'অলটাইম বাটারবন' বা একবেলা খিচুড়ি খেয়ে কাটানো সেই বছরগুলোতে রাসেলের স্বাস্থ্য ক্রমাগত ভাঙতে দেখেছি। প্রায়ই শ্বাসকষ্টে ভুগতেন। বিশেষত প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় তার শরীর প্রচণ্ড খারাপ থাকত। যদিও শরীরকে থোরাই কেয়ার করেছে রাসেলের বেপরোয়া মন। সে মারা যাওয়ার পর ডাক্তার যখন বললেন, কারণটা হার্ট-অ্যাটাক; সাথে সাথে স্মরণে এলো স্বরূপকাঠীর প্রত্যন্ত গ্রাম রাজবাড়িতে আমাদের সিনেমার শেষভাগের শুট চলাকালে তার অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনা। শেষদিকে তিনি এতোটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে, নিজের ঘর থেকেই বের হতে পারছিলেন না। ঠিক ওই সময় রাসেল ভাইয়ের একযুগের 'লং ডিসটেন্স' প্রেমের সফল পরিণতি ঘটে; তাও বেশ সিনেমাটিক কায়দায়। সুদূর রাজশাহী থেকে সেখানে চলে এসেছিলেন তার প্রেয়সী চৌধুরী দিলনাসিত আনজুম ইথেল ওরফে ইথেল। ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন অচেনা জনপদে মাঝরাতে নৌকায় চড়ে পাড়ি দিয়েছেন সন্ধ্যানদী। এরপর থেকে এই টোনাটুনি, মানে ইথেল-রাসেল একমুহূর্তের জন্যও বিচ্ছিন্ন করতে চাননি নিজেদের। যে কারণে মহানন্দে থিতু হওয়ার চেষ্টায় ছিলেন রাসেলও। আরো গুছিয়ে নিচ্ছিলেন নিজেকে, নিজের সব কাজগুলো। প্রস্তুত হচ্ছিলেন ভয়াবহ বিপদসংকুল এক দীর্ঘযাত্রার। যোগ্যসঙ্গী পেয়ে হয়তো আগের চেয়েও দুঃসাহসী স্বপ্নবাজ হয়ে উঠেছিলেন এই জুয়ারি জাদুকর। স্ত্রীর সাথে রাসেলের প্রথম পরিচয় হয়েছিলো ইয়াহু মেসেঞ্জারের চ্যাটরুমে। সেই গল্পটা ইথেল আপু নিজেই হয়তো শোনাবেন কখনো।

১০.

রাসেল ভাই চলে যাওয়ার ঠিক এক বছর পরে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, তাকে নিয়ে আজীবন লিখে গেলেও লেখাটি অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে। মাঝে মাঝে মনে হয়, আসন্ন মৃত্যুটা টের পেয়েছিলেন প্রকৃতিপ্রেমী রাসেল। মৃত্যুর সন্নিকটে দাঁড়িয়ে তিনি লিখেছেন, "ক্ষুদ্র-মস্ত অদেখা-দেখা/ শূন্যই থাকে ঘিরে,/ শূন্য হতে আসে সবই/ শূন্যেতে যায় ফিরে।" এর আগে লিখেছেন, "মৃত্যুর আগে

জীবনের গল্পটা সম্পূর্ণ হয় না।" আরেকদিন লিখেছেন, "আয়ু লম্বা করার গোপন মন্ত্র জানার তাড়া দিলে কচ্ছপ বাবা বললেন, একটু ধীরে বাছা!"

অতীত ঘাঁটতে গেলে হায় কতো কি-ই-না খুঁজে পাওয়া যায়। মাত্রই খেয়াল করলাম, ফেসবুক-এ ভাইয়ার প্রকাশ করা প্রথম ছবিটি আমার! আপলোডের বহুদিন আগেই তিনি তুলেছিলেন এটি। ওই, যখন আমরা বরিশালে *দৈনিক সত্য সংবাদ* নামের একটি পত্রিকায় কাজ করতাম। যদিও অফিসিয়ালি পত্রিকাটির প্রধান প্রতিবেদক ছিলাম আমি আর ভাই শিল্প নির্দেশক; তবে আন-অফিসিয়ালি হেন কাজ নেই, যা আমরা না করতাম। সদর রোডের অনামী লেনের সেই পত্রিকা অফিসের সামনের দোকানে বসে চা খাওয়ার ছবিটি দেখেই স্মরণে এলো, এই দোকানের মালিককে তার ছোট সাত ইঞ্চি টিভিতে সারাদিন বাংলা ডিসকভারি আর ন্যাশনাল জিওগ্রাফি দেখতে দেখেই আমরা প্রথম ভিজুয়াল কাজ করা কথা ভেবেছিলাম। সেদিন ভোরে ভোলার লঞ্চের উদ্দেশ্যে পত্রিকা পাঠিয়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এলাকায় ফিরতে ফিরতে ভাইকে বলছিলাম, যাদের জন্য পত্রিকায় লিখছি, তাদের অনেকে পত্রিকা পড়তেও পারে না। কিন্তু এরা ভিডিও দেখে সবই বুঝতে পারে। আরেক দিন ফেরার পথে রাসেল ভাই বললেন, "বুইড়াদের জন্য কিছু কইরা লাভ নাই। ওরা কংক্রিটের মাঝে গাঁথা পাতলা ইস্পাতের পাতের মতো। কিছু বললে তার প্রভাবে কিছুক্ষণ নড়বে হয়তো, কিন্তু আবার ঠিক আগের জায়গায় এসে থেমে যাবে। আর শিশুরা হচ্ছে কাদামাটি। ওদের নিজের মতো করে গড়াও সম্ভব। যে কারণে ওদের মাথায় রেখে সব কিছু করতে হবে আমাদের।" আর এই কথাটি আমার প্রচণ্ড মনে ধরে।

একত্রে থাকার সময় আমরা বেশ কয়েকটি বাসায় থেকেছি। তবে সবচেয়ে বেশি সময় ছিলাম আদাবরের মনুসরাবাদের আরোরা হাইটস অ্যাপার্টমেন্টের ৫০২ নম্বর ফ্ল্যাটে। আকতার প্রোপার্টিজের চেয়ারম্যান নাসরিন আকতারের সহমর্মী মনোভাবের কারণেই সেখানে থাকতে পেরেছিলাম আমরা। তবে তিনি এক সময় অধৈর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন। তাকে লেখা একটি চিঠির একাংশ এখানে তুলে ধরছি "সাক্ষাতেই আপনাকে জানিয়েছিলাম, ব্যবসায়িক সংকটজনিত দুরাবস্থার জেরেই আমার ফ্ল্যাটের ভাড়া প্রদান অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। ভাড়াটিয়ার এমন মনোভাব অভদ্রোচিত বা অস্বাভাবিক মনে হওয়াটা স্বাভাবিক জেনেও নিতান্ত বাধ্য হয়েই এমন আচরণ করতে বাধ্য হয়েছি। আপনার অজ্ঞাত নয় যে, মূলত নিজের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *নৃ* নির্মাণ করতে গিয়েই আমি এই বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। যুগে যুগে সুস্থধারার নির্মাতারা এমন সমস্যায় পড়েছিলেন জেনেই হতাশাগ্রস্ত হইনি। আশা রেখেছি বলেই সহায়তা পেয়েছি। শিল্পমনারা এগিয়ে এসেছেন বা দূরে থেকেও সাহায্য করেছেন বলেই *নৃ* আজ শেষের পথে। আপনি বা আপনারা, অর্থাৎ আকতার প্রোপার্টিজও আমাকে বা আমাদের এতোদিন ধরে সহ্য করেছেন বলে আমরা নিঃসন্দেহে কৃতজ্ঞ। তবে এবারের নোটিশ আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে, আপনাদের সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। কারণ, এর আগে প্রায় দুই লাখ টাকা বকেয়া থাকাকালীনও আমরা এই জাতীয় কোনো নোটিশ পাইনি। অতএব এবার বুঝতেই পারছি, সময় এসে গেছে। যেভাবে হোক হিসেব চুকিয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারলেই এখন আপনারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। আমি বা আমরাও আপনাদের নিরাশ করব না। কারণ, পরোক্ষভাবে আকতার প্রোপার্টিজ বা আপনিও আমাদের প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গী হয়েছেন। যে কারণে আমরা নৈতিকভাবেও অনেক ঋণী।"

১১.

"একটা সিনেমা। অনেক অনেক কিছুর সন্নিবেশিত এক ভিন্নরূপে প্রকাশের প্রচেষ্টা। সিনেমায় তাই মাত্রা বা স্তরের খেলার মাধ্যমে সাধারণ/অসাধারণ সব বৈচিত্র ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। তবে মজার ব্যাপারটা এখানে অনেক সময় একটা সিনেমা তৈরি করতে গিয়ে অন্তরালে অদ্ভুত সব সিনেমা তৈরি হতে থাকে। অদ্ভূত আর অনাকাঙ্ক্ষিত বিচিত্রও বটে। দেখতে দেখতে ওটা সিনেমাকেও ছাড়িয়ে যায়। অনেকটা বরফের দেশে নীল সমুদ্রে ভাসমান ধবল আইসবার্গের মতোই। যে আইসবার্গের পানির ওপরে ভাসমান দৃশ্যমান অংশটুকু, পানির নিচের বিশাল অংশের তুলনায় ক্ষুদ্র হয়ে থাকে। *নৃ* সিনেমার অন্তরালের মহা-সিনেমাটা/সিনেমাগুলো সেভাবেই ডানা মেলছে। এক সময় আমরা পর্দায় পূর্ণাঙ্গ একটা কাহিনিচিত্র আকারে *নৃ* দেখে ফেলব। কিন্তু ক'জন জানবে অন্তরালের সাগরে ডুবে থাকা আইসবার্গের সেই বিশাল স্তরের কথা?" চলচ্চিত্র *নৃ*'র ফেসবুক পেইজে এক রাতজাগা ভোরে এই কথাগুলোই লিখেছিলেন রাসেল।

পেইজটি 'ডিঅ্যাক্টিভ' করে রাখা হয়েছিলো। এর আগে ভাইয়া মান-অভিমানের কোনো এক পর্বে পেইজের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের 'অ্যাডমিন প্যানেল' থেকে 'রিমুভ' করেছিলেন। পরবর্তীকালে প্রবাসে থাকা বরিশালের এক কবি, রাসেল ভাইয়ের মৃত্যুর কিছু সময় পরই বিষয়টি ফেসবুক কর্তৃপক্ষকে জানালে, তার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টটি 'রিমেম্বারিং আইডি' হয়ে যায়। যে

কারণে যারা তার আইডি-পাসওয়ার্ড জানতেন, তারাও কেউ আর facebook.com/cinema.nree'তে ঢুকতে পারেননি। এই পেইজে লেখা ছিলো আমাদের, মানে এই সিনেমার প্রায় প্রতিটি দিনের গল্প। ফেসবুক কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে বারবার জানানো হয়েছে। তারা প্রথমে ব্যবস্থা নেয়ার কথা বললেও পরবর্তীকালে কিছুই করেনি। পেইজটি হারিয়ে ফেলার কথা মনে পড়লে মনটা প্রচণ্ড খারাপ হয়ে যায়। এই মুখবই পাতার পরতে পরতে রাসেল ছিলেন।

কিছু মজার গল্পও আপনাদের জানাতে ইচ্ছে করছে। যেমন ২০১৪ সালের ২৪ ডিসেম্বরের ফেসবুকে একটি 'স্ট্যাটাস' দেয়ার মাত্র নয় মিনিটের মাথায় 'অনলি মি' করে রাখতে বাধ্য হই রাসেল ভাইয়ের নির্দেশে। স্ট্যাটাসটি ছিল "সন্ধ্যায় বরিশালের আলেকান্দার বাংলাবাজার এলাকায় হিমু তালুকদার নামের এক ভদ্রলোক আমাকে ধারালো অস্ত্র (কুড়াল) দিয়ে কোপানোর চেষ্টা করেছেন। কারণ হিসাবে বলেছেন, তার দিকে ভাব নিয়ে তাকানো হয়েছে। তার নাম আর ক্ষমতা সম্পর্কে কেনো শুনি নাই বা জানি না তা নিয়েও তিনি ক্ষিপ্ত। তছনছের চেষ্টা করেছেন চলচ্চিত্র *নৃ* ইউনিটের অস্থায়ী সম্পাদনা কক্ষ। এটা দুঃখজনক যে, তিনি আমাদের বাড়িওয়ালা, মানে স্থানীয় ফখরুদ্দিন চৌধুরী লেনের দয়াল টাওয়ারের মালিক। তার এ ভবনেই আমাদের ইউনিটের বর্তমান ক্যাম্প। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।" ঘটনার সময় রাসেল ভাই ক্যাম্পে ছিলেন না। পরে এসে মালিকের সাথে সমঝোতা করায় আমার খুবই মেজাজ খারাপ হয়। এ নিয়ে পরে অনেক তর্কও হয় আমাদের। বস্তুতপক্ষে ওই সময়ে আলোচ্য ঘটনা নিয়ে হৈচৈ-অস্থিরতা করার চেয়ে, নিরিবিলি কাজ শেষ করাই মুখ্য ছিলো আমাদের কাছে। বরিশালে *নৃ* পরিবারের প্রথম আস্তানাটিও ছিলো এই বাংলাবাজার এলাকায়। পরবর্তীকালে দুটি, যথাক্রমে গোরস্থান রোড ও কাশীপুরে। অবশেষে ফের পুরানো এলাকায় ফিরেছিলাম আমরা। ওই সময় প্রতিদিনই এমন অসংখ্য গল্প তৈরি হয়েছে আসলে। কখনো সময় সুযোগ হলে হয়তো আরো বলা হবে।

তার আগে যখন চিত্রায়ণের মাত্র ১৫ ভাগ কাজ বাকি, কোনোভাবেই টাকা যোগার হচ্ছিল না, তখন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন ওপার বাংলায় জন্মানো 'বরিশাইল্যা' ফিল্মমেকার অমিত সেন। তিনি বিজ্ঞাপনের কাজ যোগার করে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, নগদ অর্থও দিয়েছেন ঢের। বাংলাদেশের ২০ জন বিজ্ঞাপন নির্মাতার কাছ থেকে আমাদের জন্য টাকা তোলার চেষ্টা করেছিলেন এ দেশের বিজ্ঞাপন নির্মাতা পিপলু আর খান। সে চেষ্টা ব্যর্থ হলেও তিনি আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন মোস্তফা সরয়ার ফারুকীও। আমরা মোরশেদুল ইসলামের সাথে দেখা করে আমাদের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানানোর পর তিনি বলেছিলেন, "শেষ করে ফেলতে পারবে মনে হচ্ছে।" তথাপি অমিত সেন না এগিয়ে আসা অবধি মোটেই স্বস্তিতে ছিলো না *নৃ* নির্মাতা ও তার ইউনিট।

এর আগে রাসেল পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রির টাকায় ২০১২ সালের আগস্টে শুরু করে *নৃ*'র কাজ। প্রাথমিক মূলধন হিসাবে ওই টাকা ছিলো নিতান্তই অপ্রতুল। এখানেও আবার একটা ছোট্ট অনুগল্প আছে। রাসেল বন্ধুত্বে ও খাতিরে বিদ্যমান বাজারদর নয়, ১০ বছর আগে প্রথমবারের মতো জমি বিক্রির ব্যাপারে যখন কথা হয়েছিলো সেইসময়ের দর নিয়েছিলেন। যে কারণে ছয়-সাত মাসের প্রস্তুতির পর ২০ দিনের শুটিংয়ে (গতো বছরের এপ্রিলে) তা শেষ হয়ে যায়। তীব্র অর্থসঙ্কটে পরে *নৃ* ইউনিট। ওই সময়ে *উইজার্ড ভ্যালী*কে আর্থিক সহযোগিতা দিতে এগিয়ে আসেন সৌদিপ্রবাসী ব্যবসায়ী ডা. আরিফুর রহমান। আমার বন্ধু পারভেজ অভির *আমাদের বরিশাল ডটকম* নামক একটি অনলাইনে প্রকাশিত সংবাদ দেখেই তিনি *নৃ* সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। পরে ফেসবুক পেইজ আর আমাদের সুহৃদ এমএস জাকির হোসাইনের কল্যাণে তার সাথে *নৃ* টিমের যোগাযোগ হয়। পরে 'বরিশাইল্যাইজম' তাকে এই টিমের পাশে এনে দেয়। গল্পের মূলভিত্তি বরিশালকেন্দ্রিক হওয়ার কারণেই চলচ্চিত্রটির পাশে দাঁড়াবার ইচ্ছা পোষণ করেন বরিশালের সন্তান ডা. আরিফ।

এর আগে *নৃ*'র অবস্থা নিউইয়র্ক প্রবাসী লেখক কুলদা রায় ফেসবুকে এক দীর্ঘ 'স্ট্যাটাস' দেন। তিনি লিখেছিলেন, "মাধবপাশা বরিশাল শহর থেকে খুব বেশি দূরে নয়। আমি বহুবার গেছি। এই পথে গুঠিয়া, চাখার, বানারীপাড়া, স্বরূপকাঠি যেতে আসতে মাধবপাশায় নেমে পড়তাম। আমার পিঠে শিবকালী ভট্টাচার্যের এগার খণ্ড। আমি ঔষধি গাছ খুঁজতে বেরিয়েছি। গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দুর্গাসাগর। শান্তশ্রী এই দীঘির সিঁড়িতে বসে থেকে দেখেছি জলের উপরে পাখি এসে নামে। তার ছায়া উড়ে যায়। মাঝখানে একটুকু দ্বীপ। হাওয়ায় কাঁপে। এই মাধবপাশায় স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে অনশন করেছিলো গ্রামের মানুষ। পঞ্চাশের দাঙ্গায় একদিনে মেরে ফেলা হয়েছিলো ২০০ জনকে। কিন্তু দুর্গাসাগর এখনো সুন্দর হয়ে আছে। হয়তো সুন্দর এরকমই। সুন্দরকে সুন্দরই থাকতে হয়। তাকে শ্রী বলে ডাকি। দুর্গাসাগর নিয়ে একটি ফিল্ম হচ্ছে। নাম *নৃ*। কোনো তরুণ করছেন। আমি তাকে চিনি না। কিন্তু দুর্গাসাগরকে চিনি বলেই তাকে অচেনা মনে হয় না। ফিল্মটি আটকে আছে ৮৫ ভাগ

হওয়ার পর। টাকা নেই। ভালো কাজে টাকা থাকে না এটা খুব স্বাভাবিক। তবু তাকিয়ে আছি দুর্গাসাগরের দিকে। কেউ হয়তো আসবেন। তখন *নৃ* ফিল্মটি দুর্গা সাগরকে নিয়ে শ্রী হয়ে উঠবে।"

১৪ আগস্ট ২০১৩, কাশীপুর, বরিশাল। *নৃ* পরিবারের তিন নম্বর ক্যাম্প-হাউস তখন বেশ সরগরম। সবচেয়ে ব্যস্ত আর্ট ডিরেক্টর থিওফিলাস ও তার দলবল। সকাল থেকে মধ্যরাত, একের পর এক সেটের কাজ যেনো শেষই হচ্ছে না। এমনই এক সকালে পরিবারের অন্যতম অভিভাবক ডা. আরিফুর রহমান এসে হাজির। উৎফুল্ল হয়ে ওঠে সবাই। কোথায় কখন কী যে জানায় প্রকৃতি, কোন ইশারায়। ঠিক ওই সময়ই সূর্যকে ঘিরে তৈরি হয়েছিলো এক পূর্ণবৃত্তের রঙধনু, কে জানে কিসের ইশারায়। তার সহায়তায় ২০১৩ সালের ২৫ অক্টোবর বরিশালের বানারীপাড়ার নরোত্তমপুর গ্রামে সিনেমার তৃতীয় দফা চিত্রায়ণের কাজ শুরু হয়। এর আগে প্রথম দু'দফায় (একই বছরের ফেব্রুয়ারি ও মার্চে) মোট ২০ দিনে সিনেমার ইনডোরের অধিকাংশ কাজ শেষ করেছিল *নৃ* ইউনিট। তাই শেষ দফার বেশিরভাগ কাজই ছিলো আউটডোর নির্ভর। প্রথম দু'দিন বৈরি আবহাওয়ায় বিঘ্নিত হয় কাজ। তৃতীয় দিনে বৃষ্টি কমলেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। টানা হরতালে বিঘ্নিত হয় শুটিং।

টানা হরতালের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্সে করে সিনেমার কলাকুশলী থেকে মালপত্র আনা-নেয়া করতে হয়েছে। এ সময় পুলিশি হয়রানিরও শিকার হন *নৃ* ইউনিটের সদস্যরা। এসব বাধা পেরিয়েই বানারীপাড়াসহ বরিশাল মহানগরীর এপিফনি গির্জা, মহাশ্মশান, নগর উপকণ্ঠের ঐতিহাসিক জলাধার দূর্গাসাগর এবং এর আশেপাশের এলাকায় কাজ চলেছে। তবে বেড়েছিলো খরচ। এরই প্রেক্ষিতে নভেম্বরে আবারো টাকা শেষ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় চিত্রায়ণের কাজ। পুনরায় অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা শুরু করে *উইজার্ড ভ্যালী*। নতুন কো-প্রডিউসার খোঁজা হয়। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়ের কাছেও সহায়তা চাওয়ার পরিকল্পনা করি আমরা।

১২.

আমরা তখন দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হলেও কেউই হতাশ ছিলাম না। ততোদিনে আমাদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মেছে, কোনো-না-কোনোভাবে এবারের আর্থিক সঙ্কটও কেটে যাবে। সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী মূল্যবোধ জাগানিয়া গল্পের এই সিনেমার কাজ দ্রুতই শেষ হবে। এই সময় পত্রিকায় দেয়া সাক্ষাতকারে রাসেলের বক্তব্য ছিলো, "চলচ্চিত্রটি শুরু করেই আমি টের পেয়েছি এ অঞ্চলে স্বকীয়তা ও নিজস্ব ভাষা শৈলী নিয়ে একটি আন্তর্জাতিকমানের পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র পরিস্ফূটনে রয়েছে বিস্তর প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু সাথে সাথে আমি এটাও বুঝতে পেরেছি লাগামছাড়া দুঃসাহস ও চলচ্চিত্রের জন্য নিজস্ব উৎসর্গ ব্যতিরেকে একটা পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রের বিকাশ সম্ভব না। তাই জেনেবুঝেই ঝাঁপ দেয়া। প্রতিবন্ধকতাকে পথের অংশ মেনেই আগাচ্ছি। যাই হোক, অনেকখানি পথ পেরিয়ে শেষ পর্যায়ে এসে আমাদের আত্মবিশ্বাসের কোনো অভাব আছে, এটা কেউ বলতে পারবে না।" রাসেল ভাই আরো বলেছিলেন, "ইতিমধ্যে আমাদের ভিজুয়াল সম্পাদনার কাজ অনেকখানি এগিয়েছে। সাউন্ড ডিজাইন, গানসহ পূর্ণাঙ্গ মিউজিক ডিজাইনের কাজও চলছে। কালার গ্রেডের জন্য ইংল্যান্ডের এক কালারিস্টের সাথে কথাবার্তা চলছে। সবকিছু মিলিয়ে চলচ্চিত্র *নৃ*'র কাজ থেমে নেই। অনেক প্রতিবন্ধকতার মাঝেও এগিয়ে চলছি আমরা।"

আরো একটা মজার গল্প বলি, তৎকালে দেশব্যাপী চলমান পেট্রোল বোমা সন্ত্রাসে তটস্থ বরিশালও। টানা ২৮ দিন শুটিং করে এসে এক বিকেলে বরিশালের গোরস্থান রোডে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলাম আমরা ক'জন। এমন সময়ে কোতয়ালী থানা পুলিশের এক টহল দলের বিচক্ষণতার সুবাদে তাদের ভ্যানে কাটানোর সুযোগ হালো আমার। প্রথম অপরাধ, উদভ্রান্ত (পুলিশের মতে, নেশাখোরের মতো) চেহারা। আরো অপরাধ, জিজ্ঞাসাবাদের কারণ জানতে চাওয়া। এরপরই আমার পকেট, মানিব্যাগ থেকে কাগজ ও পয়সা বের করে তারা দাবি করেন, ওসব গাজা আর হেরোইন সেবনের আলামত। এরই জেরে বাদানুবাদ জোরাল হয়। অবশেষে তারা আমাকে ভ্যানে উঠতে বলেন। পরবর্তীকালে এ ছবিটি তোলার সময় ফ্রেমে আসার অনুরোধ করায় পুলিশ ভাইয়েরা আরো ক্ষেপে যান। তারা বলেন, "এ ব্যাটার মাথায়ও ঝামেলা আছে।" ছেড়ে যাওয়ার আগে এসআই মজিবুর আচরণ শুধরানোরও পরামর্শ দিলেন। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম, তিনি কখনো শেখ সাদির গল্পটি পড়েছেন বা শুনেছেন কি-না।

ব্লগ দুনিয়ার মানুষদের জেনে হয়তো ভালো লাগবে; সামু, মানে বাংলা ব্লগ *সামহোয়্যার ইন*-এর বেশ পুরানো ব্লগার ছিলেন নির্মাতা রাসেল আহমেদ। 'যাদুকর' নিকের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলেন নিজেকে। তার *নৃ*'র পাশে দাঁড়িয়ে মানসিকভাবে শক্তি যারা যুগিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা আনোয়ার শাহাদাত, কবি ও চলচ্চিত্র নির্মাতা টোকন ঠাকুর, নির্মাতা আসিফ ইসলাম ও ফয়সাল রদ্দি এবং শিল্পী ও নির্মাতা অং রাখাইনসহ *নৃ*-সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তির পরিবার। গতো বছরের

মে মাসে নিজস্ব এডিটিং টেবিলে সিনেমাটির চূড়ান্ত সম্পাদনা চলছে, ঠিক সেই মুহূর্তে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করেন রাসেল। নির্মাণ শুরুর প্রায় পাঁচ বছরের মাথায় আবার থমকে যায় *নৃ*। আটকে যায় কাজ। তৈরি হয় নানামুখী শঙ্কা। এ নিয়ে যখন নানাবিধ হতাশায় ডুবে যাচ্ছি, ঠিক তখনই আবার কাঁধে হাত রেখেছিলেন অমিত সেন। জানতে চাইলেন সিনেমাটির সর্বশেষ অবস্থা, জানালেন তার চিন্তার কথাও। আবার আশাবাদী হলো আমার চলচ্চিত্র শ্রমিক সত্তা। তবে এই কথা আর বেশিদূর আগায়নি সে দফা। যার কারণ, আরেক চলচ্চিত্র নির্মাতার মাতৃভূমিতে ফিরতে না পারার হাহাকার। সে গল্প শোনানো যাবে অন্য কখনো। আশার কথা হচ্ছে, হলিউডের একটি প্রতিষ্ঠান *নৃ*'র ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছে। তবে আপাতত বিষয়টি একটু গোপন থাকাই বোধকরি ভালো। যে কারণে প্রতিষ্ঠানটির নাম, কিংবা তাদের সাথে আমাদের সংযোগকারী মানুষটির নামও উহ্য রাখলাম। শুধু এইটুকু বলতে পারি, তিনিও একজন ফিল্মমেকার। তবে যারাই সাহায্য করুক, মূল কাজটি করতে হবে ড্যানিয়েল ড্যানি, শাহরিয়ার শাওনসহ যারা *নৃ*'র 'কোর টিম'-এ ছিলেন, তাদেরই। এক্ষেত্রে ইথেল আপুও যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবেন, আশা করি। কারণ, রাসেল ভাইয়ের সর্বশেষ চিন্তাটা তিনিই সবচেয়ে ভালো জানতেন।

১৩.

রাসেল ভাইয়ের ওপর অনেক অভিমান জমেছিল আমার। কতো কিছুই না বলছি তারে এ জীবনে! আমার কতো বাজে আচরণের শিকার হয়েছে তিনি। তবু বলতেন, "পাগল, জীবনে তোর উপ্রে শেষতক কখনোই আমি গোস্বা করতে পারি না। আমার একটাই ছোটভাই ঈয়ন। আমি যে বড়ভাই হইছি। চাইলেও তো গোস্বা করতে পারি না।" সত্যিটা প্রকাশ্যেই বলি। তার প্রতি আমার অভিযোগ ছিলো, পুরো শেষ না করেই তার আনুষ্ঠানিকভাবে সংসার শুরুর সিদ্ধান্ত সিনেমাটার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এ কারণেই কাজ শেষ হতে বিলম্ব হচ্ছে। জবাবে তার বক্তব্য ছিলো, "'সিনেমা'র ভাষাতেই বলি তুই তোর পয়েন্ট অব ভিউ বললি। ঘুরে আমার পয়েন্ট অব ভিউটাও দেখার চেষ্টা করিস। দোয়া করিস আমার জন্য। সময়মতো *নৃ* নিয়ে হাজির হয়ে যাব। এতো সময় পার হয়ে, এটাকে আর যেনোতেনো রূপে না এনে, নিজের রূপেই দাঁড় করাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছি।" এখন ভাবি, তিনি যদি তখন বিয়েটা না করতেন, তবে নিজের সংসার গড়ার স্বাদ পাওয়াই হতো না তার। তাছাড়া রাসেলের সিনেমার চেয়েও পুরানো প্রেম ইথেল। সেদিন ভাই পাল্টা অভিযোগ করে বলেছিলেন, "আমাদের সিনেমাটা সত্যিই কি আমাদের সবার হাত ধরে পাড়ি দিচ্ছে পথ? নাকি আমার একার পিঠেই গোটা ওজন চাপিয়ে সওয়ার হইছে? একটু ভালা কইরা ভাইবা দেহিস।" মুহূর্তে মনে পড়ে গিয়েছিলো নিজের তামাম স্বার্থপরতা। অপরাধবোধে কুঁকড়ে গিয়েছিলাম। তিনি আমার অবস্থা বুঝতে পেরেই হয়তো বলেছিলেন, "ঈয়ন, মানুষ বুঝলো না, চলচ্চিত্রের এই আকালে নির্মাতাদের নার্সিং দরকার। উৎসাহ প্রেরণার দুর্ভিক্ষে যেনো কাউকে নিরুৎসাহিত না করা হয়। সবকিছুতে তোর যে তুমুল উৎসাহ দেখেছি, সেই ঈয়নটাই আবার আবির্ভূত হোক। এই দোয়াই করি।" তখন স্মরণে আসে বহু আগে রাসেল ভাই আমাদের দুজনের একটি ছবির ক্যাপসনে লিখেছিলেন, "বিভ্রান্ত হতেই পারি/ তবে দিকভ্রান্ত নই/ আমরা দুই ভাই"। তবুও এই বিভ্রান্তি কাটাতে বড় দেরি করা হয়ে গিয়েছে হয়তো। যদিও আমরা বিশ্বাস করি, যা হওয়ার তা'ই হয়, হবে।

রাসেল ভাইয়ের মৃত্যুর কয়েক দিন পরই মারা যায় আমাদের আলোকচিত্রী বন্ধু হান। তারপরই বরিশালের সহযোদ্ধা সাংবাদিক লিটন বাশার। এসব দেখে-শুনে আমার আরেক অগ্রজ বান্ধব নূরুল আলম আতিক বলেছিলেন, "তোমার বন্ধু হওয়া-তো আসলেই দুশ্চিন্তার!" একই কথা এক পরমাত্মীয়ও একটু অন্যভাবে বলেছিলেন। তার প্রশ্ন ছিলো, "তুই বেছে বেছে শুধু এমন মানুষদের সাথেই কিভাবে বন্ধুত্ব করিস, যারা অকালে চলে যায়?" ভেবে দেখলাম, বন্ধুত্বও আদতে প্রেমের মতো। করা যায় না, হয়; আর মনে মন মিলে গেলে তা টিকেও যায়। যাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব এভাবে টিকে গেছে; চেয়ে দেখি তাদের কেউই ছাপোষা জীবনে অভ্যস্ত নন। প্রত্যেকের পথ ভিন্ন হলেও সকলেই পুড়েছেন বা পুড়ছেন; নানাবিধ দহনে। যার একমাত্র কারণ তারা প্রত্যেকেই প্রচণ্ড স্পর্শকাতর। মূলত প্রখর অনুভূতিই তাদের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে, করছে। গতো দেড় দশকে আমি যে দুই ডজন বন্ধু-সহযোদ্ধা হারিয়েছি, তাদের সিংহভাগই মূলত আত্মহত্যাকারী। কবি ইমতিয়াজ মাহমুদের ম্যাক্সিম সিরিজের একটা লেখা এখানে প্রাসঙ্গিক; যার শিরোনাম 'আত্মহত্যা'। যেখানে লেখা হয়েছে "পৃথিবীর মানুষেরা আত্মহত্যার অনেক কৌশল আবিষ্কার করেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে ভালোটি হচ্ছে মরবার অপেক্ষা করতে করতে একদিন মরে যাওয়া।" হয়তো আমাদের সময়টাই পতনগামী।

১৪.

রাসেল ভাইয়ের মতো নিভৃতচারী মানুষের মৃত্যুতে এতোটা তোলপাড় হবে, ভাবিনি। কিন্তু হয়েছে। খবরটা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। মোস্তফা সয়রার ফারুকী, মাসুদ হাসান উজ্জলসহ অনেক নির্মাতা, লেখক, কবি, মূলত অজস্র পুরনো সহযোদ্ধা ও শুভাকাঙ্ক্ষী তাকে নিয়ে বললেন, লিখলেন। রাসেলের মৃত্যুর ১১ দিনের মাথায়, গতো বছরের ২৬ মে বিকেলে শাহবাগের ছবির হাটে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের চারুকলা ইনিস্টিটিউট সংলগ্ন গেটের সামনে) *রাসেল স্মরণ* বৈঠকে তার সুহৃদ-বন্ধু, স্বজন ও সহকর্মীরা বললেন, নির্মাণাধীন চলচ্চিত্র *নৃ* শেষ করার দায়িত্ব এখন আমাদের সকলের।

বৈঠকে বলা হয়, রাসেল আহমেদ ছিলেন এক স্বপ্নবাজ জাদুকর। শৈশব থেকেই চিন্তাশীল এই মানুষটি যে কোনো মানুষের কষ্টেই ব্যথিত হতেন। তবে তার মনের এ স্পর্শকাতরতা পরিবারের সদস্য, এমনকি বন্ধুদের অনেকেও ঠিক বোঝেনি। পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে সিনেমা বানানোর সিদ্ধান্তকেও পাগলামি ভেবেছেন কেউ কেউ। তবে এখন তাদের মনে হচ্ছে, রাসেলের জন্য অনেক কিছুই করার ছিলো। অন্তত তার সিনেমাটির পাশে দাঁড়ানো দরকার ছিলো। কারণ, তিনি স্রেফ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নয়, মানুষের বোধ ও চিন্তাকে উন্নত করতে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে নেমেছিলেন। আমৃত্যু মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন। বক্তারা আরো বলেন, রাসেল ও তার টিমের সদস্যরা খেয়ে না খেয়ে যেভাবে নিজেদের সিনেমার করেছেন, সে ইতিহাস একসময় চলচ্চিত্র শিক্ষার্থীদের পাঠ্য হবে নিশ্চিত। রাসেলের সহযোদ্ধারা বাংলাদেশের সিনেমায় আগামীতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে এমনটাও আশা অনেকের। তবে সকলেই একমত যে, সবার আগে *নৃ* সিনেমাটিকে মুক্তির আলোয় নিয়ে আসতে হবে।

বৈঠকে বক্তব্য রাখেন কবি ও নির্মাতা টোকন ঠাকুর, প্রকাশক রবীন আহসান, কবি ও আবৃত্তিকার সাফিয়া খন্দকার রেখা, অভিনেতা ম ম মোর্শেদ, চলচ্চিত্র নির্মাতা ফয়সাল রদ্দি, চলচ্চিত্র নির্মাতা অং রাখাইন, মাহবুব হোসেন, ইফতেখার শিশির, ইমতিয়াজ পাভেল, সাংবাদিক সাইফ ইবনে রফিক, ভাস্কর ও লেখক গোঁসাই পাহলভী, কবি ও সাংবাদিক রুদ্র আরিফ, আবদুল্লাহ মাহফুজ অভি, সঙ্গীত শিল্পী সম্রাট, কিম্বেল অভি, সিনা হাসান, কবি মাহমুদ মিটুল, কিং সউদ, রাসেলের মেঝভাই মোহাম্মদ শফিকুল আলম মুকুল, শৈশবের বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার এসএম পলাসহ আরো অনেকে। দুঃখভারাক্রান্ত মনে পরম শ্রদ্ধার সাথে রাসেলকে স্মরণ করেন তারা।

সেদিন টোকন ঠাকুর বলেন, "রাসেল সিনেমাটি [*নৃ*] প্রায় শেষ করে এনেছিলেন, কিন্তু এর মুক্তি দেখে যেতে পারলেন না। এটি মুক্তি না পাওয়া অবধি তার আত্মা শান্তি পাবে না।" রবীন আহসান বলেন, "বাজারি ধারায় সবাই যেভাবে সিনেমা বানাচ্ছে, রাসেল সেভাবে বানাতে চায়নি। নিজের মতো করেই গল্প বলতে চেয়েছে। এই প্রবণতা দেখেই বুঝেছিলাম, সে আসলে শিল্পী।" রাসেলের মেঝভাই মুকুল বলেন, "সত্যি কথা বলতে কি, সে আমাদের মাঝে বড় হলেও আমরা তাকে চিনতে পারিনি। আজ আপনাদের মাঝে এসে, কাজের কথা শুনে তাকে নতুন করে চিনলাম।"

গতো দশকে যখন রাসেল ভাইয়ের সাথে বরিশালের আঞ্চলিক পত্রিকায় কাজ করি; তখন থেকেই দেখেছিলাম দেশের দৈনিক পত্রিকাগুলোর মধ্যে *প্রথম আলোর* প্রতি এক ধরনের বাড়তি মমত্ব বা ভালোলাগা কাজ করে তার। তাদের সংবাদ তৈরি ও পরিবেশনার ঢঙ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগের ঘোর প্রশংসাকারী ছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে আমরা যখন কাজের মিডিয়াম বদলে চলচ্চিত্রে মনোযোগী হই, ঢাকায় একসঙ্গে থাকা শুরু করি, তখনো বাসায় *প্রথম আলো* পত্রিকাই রাখা হতো। রাসেল ভাই বিশ্বাস করতেন আসলেই "যা কিছু ভালো, তার সঙ্গে প্রথম আলো"।

২০১৩ সালের জুনে যখন নির্মাণাধীন চলচ্চিত্র *নৃ* নিয়ে আমরা প্রেসের সামনে হাজির হই; এর আগে ও পরে অজস্র গণমাধ্যম সিনেমাটি নিয়ে একাধিকবার সংবাদ প্রকাশ করে, কিন্তু *প্রথম আলো* কেনো জানি চুপ ছিলো। তাদের নীরবতা ভাঙাতে আমাদের সাংবাদিক বন্ধু রঞ্জু চৌধুরী (সমকাল) খোদ রাসেল ভাইকেই নিয়ে গিয়েছিলেন পত্রিকাটির বিনোদন বিভাগের প্রধানের কাছে। সম্ভবত মেহেদী (আগে/পরে কিছু আছে), ভদ্রলোকের নাম। ভাইকে তিনি বলেছিলেন, "আগে সিনেমাটি শেষ করে তারপরে আসেন।" তার আগে *নৃ* নিয়ে কিছু না লেখার কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন, পত্রিকাটি ইতোপূর্বে যেসব ইন্ডিফিল্মকে শুরুতেই প্রচুর সাপোর্ট দিয়েছে, সেগুলোর অধিকাংশই পরে কাজ শেষ করেনি। *প্রথম আলোর* ওই আচরণে রাসেল ভাই বেশ কষ্ট পেয়েছিলেন; যদিও বুঝতে দিতে চাননি। বাসায় ফেরার পর শুধু বলেছিলেন, "*নৃ* মুক্তির আগে *প্রথম আলোতে* আর কোনো সংবাদবিজ্ঞপ্তি পাঠাইস না। তারা বিরক্ত হতে পারে।" আমিও আর পাঠাইনি। অথচ সেই পত্রিকায় মুক্তির আগেই সিনেমাটি নিয়ে, মূলত ভাইয়ার মৃত্যুর গল্প নিয়েই প্রকাশিত হলো এক বিশেষ রচনা। অবশেষে প্রিয় *প্রথম আলো* তাকে, তার সৃষ্টিকে স্থান দিয়েছে। কোথাও বসে এসব দেখে তিনি খুব হেসেছেন নিশ্চয়ই।

বিভিন্ন সময়ে নানা বয়স ও পেশার অনেকেই চলচ্চিত্র নির্মাতা রাসেলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। একাত্ম হয়েছেন *নৃ* পরিবারের সাথে। অংশ হয়েছেন এ প্রচেষ্টার। মানবতাবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার বার্তা ছড়ানোর তাগিদে সহযোদ্ধা হয়েছেন বিভিন্ন গণমাধ্যমের বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষীরা। তাদেরই মধ্যে রবিন শামস, গোলাম রব্বানী, কামরুল ইসলাম রিফাত, দিল আফরোজ জাহান, শিমুল সালাউদ্দিন ও রাগিব রেজা অন্যতম। তাদের স্ব-উদ্যোগী বহু প্রয়াস আমাদের আশাবাদী করে তুলেছে বহুবার। *নৃ*'র খবর প্রথম প্রকাশিত হয় *দৈনিক যুগান্তর*-এ। লিখেছিলেন ইশতিয়াক নামের এক সাংবাদিক। রাসেল ভাই খুবই পছন্দ করতেন তাকে। এর আগে তিনি রাসেল ভাইয়ের তোলা ছবি নিয়েও পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। তবে যেদিন *নৃ* নিয়ে লেখাটি প্রকাশিত হয়, সেদিন আমাদের দুজনের কারোই আট টাকা দিয়ে একটি পত্রিকা কেনার সামর্থ্য ছিলো না। তবে দুজনেরই ভরসার জায়গা ছিলো নিজ নিজ প্রেয়সীরা। দূরে থেকেও যারা সার্বক্ষণিক আমাদের সাথে থেকেছে। বছরের পর বছর শতো দুর্ব্যবহার মেনে নিয়ে মূলত সবচেয়ে কঠোর সহযোদ্ধার ভূমিকা পালন করে গেছে। হয়তো আমরা দুজনেই মনোগামী বলে, সহযাত্রাটা সহজ হয়েছে। তবে বহুগামীদের প্রতিও আমাদের কোনো অনুযোগ ছিলো না। বিষয়টা রুচির ভেদ বলেই আমরা ভাবতাম। তবে হ্যাঁ, মনোগামিতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ছিলো নিশ্চয়ই।

১৫.

অনলাইন জার্নাল *ফিল্মফ্রি* সম্পাদক, কবি রুদ্র আরিফের তাগাদায় এই লেখাটা শুরু করেছিলাম; রাসেল ভাইকে কবরে শুইয়ে আসার মাত্র তিনদিন পর। প্রায় এক বছরেও এটি শেষ করতে পারিনি মূলত একটি কারণে। বারবারই মনে হয়েছে, কতোকিছুই না লেখা বাকি! এই যেমন, বয়সে মাত্র পাঁচ বছরের বড় এসএম তুষারের নির্দেশনায় প্রথম মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন আগুয়ান খেলাঘরের শিশু শিল্পী রাসেল। পরে আবার তারই নির্দেশনায় জীবনে প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান তুষার। আমৃত্যু তাকেই নিজের ওস্তাদ বলতেন *নৃ* নির্মাতা। তিনি বলতেন, চিন্তার দারিদ্রতা দূর করতে তাকে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছেন এই মানুষটি। ভেতরের শৈল্পিক সত্তাকে শক্তিশালী করার তাগিদও তিনি পেয়েছেন তুষারকে দেখে। কাকতালীয়ভাবে একই ঘটনা আমার ক্ষেত্রেও ঘটেছে। পাড়ার হাশেম কুটিরের এই মানুষটি আমাদের অনেক 'পোলাপাইনের মাথা খাইছে' বলে কথিত রয়েছে। তিনি মূলত একজন লেখক, গবেষক ও সাংবাদিক। সর্বহারা পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৮৮-৮৯ সালে তিনি বিতর্কিত বিপ্লবী সিরাজ সিকদারের কবিতা অবলম্বণে গণযুদ্ধের পটভূমি নামে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। তারো আগে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন *আইজেনেস্টাইন ফিল্ম সোসাইটি*। যেদিন রাসেল ভাই ও আমি টের পেয়েছিলাম যে, আমাদের ওস্তাদ একই, সেদিনটার কথা মনে আছে এখনো। এসএম তুষারকে নিয়ে অনেক আলাপ হয়েছিলো আমাদের। পরে আমরা তার একটা লম্বা ভিজুয়াল সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। রাসেল ভাইয়ের কোনো হার্ডড্রাইভ বা কম্পিউটারে সেটা পাওয়া যাবে নিশ্চিত। *নৃ* সিনেমায় তুষার ভাইকে অভিনয় করানোর পাশাপাশি তার লেখা তিনটি গানও ব্যবহার করা হয়েছে।

এখানে পাঠকদের জন্য আরো কিছু তথ্য টুকে রাখি। *প্রবাহ* নামের যে ক্লাবের সক্রিয় সদস্য ছিলেন রাসেল, সেই ক্লাবটি এখন মসজিদ। তারো আগে রাসেল ছিলেন *আগুয়ান খেলাঘর*-এর সদস্য। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *ডিভি লটারী*, *ব্যাক টু দ্য প্যাভলিয়ন* ও *বর্ণমালা যোদ্ধার* স্ক্রিপ্ট ডেভেলপ, সিনেমাটোগ্রাফি, ভিডিও সম্পাদনা করেছেন রাসেল। তা স্বরচিত ও পরিচালিত 'মাইক্রো মুভি' *ব্রেকিং নিউজ*, *ব্রেক দ্য ভার্টিকাল লাইন*, *লুক ওয়াইডলি*; প্রামাণ্যচিত্র *চারণ সম্রাট*, *মনোরমা বসু মাসিমা* এবং মিউজিক্যাল ফিল্ম *সোনাই নদীর কাজ* অবশ্য একটিও শেষ করে যেতে পারেননি। *ফ্লাই-ওভার* ছাড়াও রাসেল আরো যেসব নাটক নির্মাণ করেছেন, তার মধ্যে *হোমো-এলিয়েন্স* ও *কনফেশন* অন্যতম। রাসেল আরো যেসব সিনেমার গল্প বুঁনেছেন, তার মধ্যে *ডানা*, *নিড়ানী*, *পিকু পালাচ্ছে*, *ছোট কুমার*, *বুমেরাং* আর *ড. মঙ্গালুর* কথা মনে পড়ছে এই মুহূর্তে। সারা দুনিয়ায় রাসেল নামের যতো ব্যক্তি আছেন, তাদের সকলকে একত্রিত করে রাসেল উৎসব করার ইচ্ছে ছিলো তার। আপাতত আমাদের ইচ্ছে, তার প্রতি জন্মদিনে রাসেল উৎসব করার। যদিও তা ঠিক কোন বছরে শুরু করা যাবে, তা এখনই নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।

১৬.

নৃ আসলে মূলত সম্পূর্ণ নতুনদের একটি নির্মাণ প্রয়াস। এর সাথে জড়িতদের মধ্যে দুয়েকজন অভিনয়শিল্পী ছাড়া আর কারোই চলচ্চিত্রে কাজের অভিজ্ঞতা নেই। এই যেমন নিজের কথাই বলি, এতো দ্রুত সিনেমায় ক্যামেরা চালাতে হবে তা আসলে কাজটি শুরুর আগে কল্পনাও করিনি। আর তাই সিনেমা নির্মাণের কাজ যে এতোটা সিনেমাটিক, তাও আগে আন্দাজ করতে পারিনি। মেইনস্ট্রিম ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কীভাবে কাজ হয় বা কোন ফর্মুলায় সেখানাকার চলচ্চিত্রগুলো তৈরি হচ্ছে তা নিয়ে নিজেদের মতো

করে গবেষণা করা হয়েছে। ঘাঁটাঘাঁটি করা হয়েছে দেশ-বিদেশের স্বাধীন নির্মাতাদের নির্মাণকৌশল নিয়েও। এরপর ঠিক করা হয়েছে *নৃ* কীভাবে তৈরি হবে। মানে, আমাদের নির্মাণকৌশল কী হবে। এক্ষেত্রে আমাদের ঝুঁকিটাও ছিলো অনেক বেশি। কারণ, প্রথমদিন শুট শুরুর পরই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, আমরা যতোটা নিখুঁতভাবে গল্পটা বুনতে চাচ্ছি, তা এতো কম টাকায় সম্ভব না। তখন আমাদের সামনে দুটো পথ খোলা ছিলো। হয় বহুকিছু ছাড় দিতে হবে, নয়তো অভাব মেনে নিয়ে কষ্ট করে কাজ করতে হবে। শুধুমাত্র টাকার অভাবে যে আরো কতোকিছু ঘটেছে। এখনো যে অভাব কাটেনি। তবে শেষের দিকের এক আলাপে ভাই বলেছিলেন, "*নৃ*'র পথটাই আলাদা। *নৃ* মুক্তি পাবে। যাবতীয় দেনা শোধ হবে। রাসেল আহমেদ স্বকীয়রূপে ফিরবে। ইনশাল্লাহ্। তারপর তো.. গোটা পৃথিবীই আমাদের জন্য।"

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: লেখাটি অনলাইন জার্নাল www.filmfree.org-এ ৬ জুন ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত।– সম্পাদক]